হরর কাহিনী

ধূসর আতঙ্ক

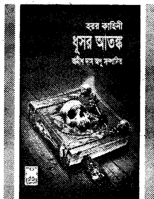
অনীশ দাস অপু সম্পাদিত



হরর কাহিনি

ধূসর আতঙ্ক

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত

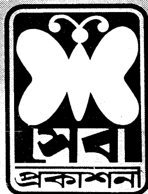




সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-0231-8
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৬
প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩
DHOOSHAR ATANKO
Horror Stories
Edited by: Anish Das Apu



তেত্রিশ টাকা

উৎসর্গ

কাজী সারওয়ার হোসেন

যাঁর হরর গল্পের আমি অনুরাগী পাঠক

সূচি

ভূমিকা

আমার সম্পাদিত 'নরসিংহপুরের পিশাচ' এবং 'অশরীরী আতঙ্ক' প্রকাশিত হওয়ার পরে ভেবেছিলাম এবার নিজের লেখালেখিতে মনোযোগী হব। টিংকু ভাইকে (কাজী শাহনূর হোসেন) বলেওছিলাম একটি পিশাচ কিংবা হরর গল্প সংকলনের জন্য লেখা তৈরি করব। তাঁর বরাবরই এদিকে আগ্রহ বেশি। তবে নিজের বইয়ের জন্য গল্প লেখার প্রস্তুতি মাঝপথে থেমে গেল রহস্যপত্রিকার পুরানো কতগুলো কপি ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে। (অবসরে এ কাজটা মাঝে মাঝে করি আমি) পেয়ে গেলাম চমৎকার কিছু হরর গল্প। এক বৈকালিক আড্ডায় টিংকু ভাইকে গল্পগুলোর কথা বলতেই লাফিয়ে উঠলেন। উৎসাহ দিলেন এসব গল্প দিয়ে আরেকটি সম্পাদিত হরর গল্প সংকলন বের করতে। আগের দুটো সংকলন করে পাঠকের কাছ থেকে ভালোই সাড়া পেয়েছি। আরেকটা এরকম সংকলন করলে মন্দ হয় না। তাই পরিশ্রমসাধ্য কাজটাতে লেগে গেলাম আবার। রহস্যপত্রিকার নিয়মিত লেখকদের পাশাপাশি নবীন লেখকদের প্রতিও আমার আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। এবং নবীনরা আমাকে হতাশ করেননি মোটেই। কেউ কেউ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের চেয়ে ভাল লিখেছেন। আমি যে একটুও বাড়িয়ে বলছি না পাঠক বইটি

পড়লেই তা উপলব্ধি করতে পারবেন। কারও কারও গল্প বুকে সত্যি কাঁপ ধরিয়ে দেয়, কেউবা বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে তোলেন। তবে এ সংকলনের দু'টি গল্প (কবর এবং অশরীরী) কিশোরপত্রিকা থেকে ধার নেয়া। গল্প দুটো আমার কাছে এত ভাল লেগে গেল যে এ সংকলনে ঢুকিয়ে দেয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। পাঠক, আশা করি আপনারও ভাল লাগবে।

ওহ্হো, বলতে ভুলে গেছি! পাঠক অচিরেই 'ভ্যাম্পায়ার' নামে একটি পিশাচ সংকলন উপহার পাবেন। বইটির সম্পাদনার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। ওতেও দারুণ দারুণ সব গল্প থাকবে।

ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন।

অনীশ দাস অপু
২৬৩, জাফরাবাদ, শঙ্কর
ঢাকা।

খাদক

এক

'আমার ভীষণ ভয় করছে!'

স্বামীর কাছে শেষ পর্যন্ত নিজের ভয়ের ব্যাপারটা অকপটে স্বীকার করে ফেলল মিথি। 'দেখো, তোমার এ ধরনের কথা-বার্তা আমার একদম ভাল লাগছে না। আমি তোমাকে এখানে আসতে বলিনি। জোরও করিনি। শুধুমাত্র তোমার সীমাহীন আগ্রহেই আমরা এখানে এসেছি।'

'কিন্তু তখন কী বুঝেছি–এরকম পরিস্থিতিতে পড়তে হবে আমাকে?'

'তুমি শুধু-শুধু কথা বাড়াচ্ছ। তোমাকে স্পষ্টভাবে আমার গ্রামের বাড়িটা সম্পর্কে বলেছি। কী তোমাকে বলিনি– গত পাঁচ বছর ধরে গ্রামের বাড়িতে কেউ থাকে না? খালি পড়ে আছে। নতুন একজন কেয়ারটেকার রাখা হয়েছে। গ্রামে ইলেকট্রিসিটি দূরের কথা, আধুনিক সভ্যতার তেমন ছিটেফোঁটাও নেই। স্টেশন থেকে গ্রামের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে প্রায় দশ মাইলের মত যেতে হয়। এসবের কিছুই গোপন করিনি। এরপর তুমিই জেদ ধরেছ

গ্রামের বাড়িতে আসবে। আর এখন বলছ ভয় করছে–এটা করছে– সেটা করছে।'

এবার মিথিও জেদের সাথে জবাব দিল, 'দেখো, হাসান, দু'বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে অথচ এখন পর্যন্ত কোথাও বেড়াতে যাইনি। কখনও গ্রাম দেখিনি বলে তোমার গ্রামের বাড়িটা দেখতে এসেছি। কিন্তু এখন তুমি রাতের ট্রেনে এসে কোথাকার কোন কেয়ারটেকারের জন্য রাত দুটার সময় স্টেশনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখবে আর আমি একটু ভয়ের কথা বলেছি বলে আমার উপর তেজ দেখাবে– এটা ঠিক না।' কথাগুলো বলে মিথি অন্য দিকে ফিরে বসল।

হাসান কিছুক্ষণ চুপ থেকে শেষে শান্তি স্থাপনের সুরে বলল, 'আসলে বুঝতেই পারছ– টেনশনে আছি। কেয়ারটেকারকে বলেছিলাম ভ্যান-ট্যান নিয়ে স্টেশনে থাকতে– তারও কোন দেখা নেই। রাস্তা-ঘাট প্রায় সবই ভুলে গেছি– তার উপর গভীর রাত। একটা মানুষও তো দেখলাম না। কী যে করি...'

হাসান কথা শেষ করতে পারেনি এমন সময় খুব কাছ থেকে কে যেন ভয়ার্ত গলায় চিৎকার করে উঠল। রক্ত হিম করা সে চিৎকার রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দিল। মিথি প্রায় উড়ে এসে হাসানকে জড়িয়ে ধরল। ভীত গলায় ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'ও-ও-ওখানে কে-এ-এ? হা-সা-আ-আন?'

হাসানও প্রথমে হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল। একটু পরেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হেসে উঠল। 'হাঃ হাঃ হাঃ ও কিছু না। এরকম 'ডাকডুক' গ্রামে রাতের বেলা সবসময়ই শোনা যায়। কত ধরনের প্রাণী আছে! খাটাস, শিয়াল, পেঁচা– কত কী! তুমি দেখছি ভয়ে একেবারে আধমরা হয়ে গেছ। হাঃ হাঃ– আরে এত ভয় পেলে গ্রামে থাকবে কী করে!'

হাসানের কথা শুনে ওকে ছেড়ে দিয়ে মিথি কিছুটা স্বাভাবিক হলো।

'আসলে– আমি ঠিক...'

হাসান হেসে বলল, 'ওকে, আমি বুঝতে পেরেছি– তবে আবার ওভাবে একটু জড়িয়ে ধরো না!'

'উঁহ, শখ কত!'

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। দু'জনেই চুপচাপ। শেষে মিথিই কথার খেই ধরে, 'তোমাদের এখানে কারেন্ট নেই বলেই জানতাম– কিন্তু ওই যে লাইটপোস্ট দেখতে পাচ্ছি।'

'শুধু স্টেশনে– আর ওই উত্তরে আছে।'

হাসানের কথাটা শেষ হওয়ার আগেই ওদেরকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে বালবটা 'ঠাস্' করে শব্দ করে ভেঙে গেল। হঠাৎ আলো থেকে অন্ধকার হওয়ায় হাসান কিছুই দেখতে পেল না। শুধু বুঝতে পারল মিথি আবারও আগের চেয়ে শক্ত করে ওকে জাপটে ধরেছে। জড়িয়ে ধরার সময় ছোটখাট একটা চিৎকারও দিয়ে ফেলেছে।

সবকিছু শান্ত। মিথি কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'হাসান– এটা কেন হলো, বলো তো?!'

হাসান আশ্চর্য হলেও তৎক্ষণাৎ যুক্তি দাঁড় করে ফলল। 'কোন বাদুড়-টাদুড় হবে।'

'উঁহুঁ, অসম্ভব! বাদুড় চোখে দেখতে না পেলেও ওদের পথ চলা মানুষের চেয়েও নির্ভুল। এটা বাদুড়ের কাজ হতেই পারে না। নিশ্চয়ই ভূত-টূতের কাজ! হা-সা-আ-আন!...আমার ভয় কর-ছে-এ-এ!'

'আরে! ধ্যেৎ। যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করো। সম্ভবত অন্য কোনও প্রাণী, কিংবা হয়তো বালবটা ঠিক মত

লাগানোই হয়নি!'

'কিন্তু তাই বলে আমরা বালবের কথা বলা মাত্র এরকম ঘটল কেন?'

'তাই বলে এটা ভূতের কাজ বলতে চাচ্ছ?! আশ্চর্য! স্রেফ কাকতলীয় ব্যাপার।'

মিথি আর কিছু বলল না। আবার খানিকক্ষণ নীরবতা। হঠাৎ মিথি বুঝতে পারল হাসান কিছু একটা করছে। অন্ধকারে ঠিক মত ঠাহর হচ্ছে না।

'কী করছ?'

'অ্যা– কিছু না। পেয়েছি। টর্চ লাইট। যাক বুদ্ধি করে এনেছিলাম।'

মিথি শান্ত সুরে বলল, 'বুদ্ধিটা তোমার না জনাব, আমার। শুধু টর্চই আনিনি। এক্সট্রা এক ডজন ব্যাটারিও এনেছি। আর টর্চ একটা নয়, দুইটা।'

'বাহঃ! তোমার তো অনেক বুদ্ধি। তোমার মার এত বুদ্ধি কেন ছিল না বলো তো?'

'কেন?! এ কথা কেন বলছ?'

প্রশ্নটা শুনে হাসান মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'না– মানে, তোমার বাবা তো এখনও দেউলিয়া হয়নি, তাই!'

হাসান ভেবেছিল মিথি হয়তো রাগে ফেটে পড়বে। কিন্তু আসলে তা হলো না। মিথি হেসে উঠল। হাসানও মিথির সাথে হেসে ফেলল। হাসান টর্চটা জ্বালাতে যাবে– এসময় মিথি ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠল, 'হাসান, শুনতে পাচ্ছ?'

'কী শুনব?!'

'ওই যে, শব্দটা শুনতে পাচ্ছ?'

হাসানও শুনতে পেল। 'হুঁ; সম্ভবত কেউ আসছে এদিকে।'

অন্ধকারে দু'জনেই শব্দের উৎসের দিকে তাকিয়ে থাকল। শব্দটা আস্তে আস্তে জোরাল হচ্ছে। মিথি চাঁদের আবছা আলোয় একটা মানুষের অবয়ব বুঝতে পারছে। এমন সময় হাসান সরাসরি লোকটার মুখে টর্চের আলো ফেলল।

দাড়ি ভর্তি কালো একটা মুখমণ্ডল। নাকটা ভোঁতা। চোখ দু'টি বড় বড়। মুখে একধরনের হাসি। ধরনটা কী রকম হাসান ঠিক বুঝতে পারছে না। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে তীব্র আলোতেও লোকটার মুখ এতটুকু কুঁচকায়নি। লোকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। হাসান টর্চের আলো অন্য দিকে সরিয়ে নিল।

'তুমি কে?'

প্রশ্নের উত্তরে লোকটা গা জ্বালানো হাসি দিয়ে বলল, 'হেঃ হেঃ হেঃ, সার, আমি। আপনেগোর নতুন কেয়ারটেকর।'

হাসান টর্চের আলোয় ঘড়ি দেখে বলল, 'তোমাকে কয়টায় থাকতে বলেছি আর তুমি কয়টায় এলে?'

'হেঃ হেঃ হেঃ সার আইতে আইতে দিরং অইয়া গেল, হেঃ হেঃ হেঃ...'

'দেরি হয়েছে তো হাসছ কেন?' রাগ রাগ গলায় বলল হাসান।

'হেঃ হেঃ হেঃ. সার ভুল অইয়া গেছে। হেঃ হেঃ, ভুল তো মাইনষেরই অয়, হেঃ হেঃ হেঃ।'

হাসান এবার উচ্চস্বরে ধমকে উঠল, 'আবার হাসছ? Nonsence.'

লোকটা এবার কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে চুপচাপ মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল। হাসান শান্তস্বরে জানতে চাইল, 'ভ্যান-ট্যান কিছু এনেছ?'

লোকটা আবারও আগের মত হেসে বলল, 'হেঃ হেঃ হেঃ,

সার; আর কইয়েন না। ওই হালারপুতের লাইগ্যাই তো দিরংটা অইল। হাইন্দার হময় গেছি ভ্যানের লাইগ্যা–হেঃ হেঃ, গিয়া দেহি হালায় বউয়ের লগে ইস্টিংফাইট করতাছে। হালায় মারে এডা–তয় বউয়ে মারে চাইড্ডা, হেঃ হেঃ! এইডা এডা দিরিশ্য! আফনে না দেহলে বুঝবার পাইতেন না। হগলের লগে খাড়য়ে খাড়য়ে দেহলাম। হময় বুইজ্যা বাড়ির পিছে থ্যে রশি খুইল্যা আমি নিজেই ভ্যান লইয়া আইয়া পড়ছি– হেঃ হেঃ!।'

অবাক হয়ে মিথি জিজ্ঞেস করল, 'তোমার তো পায়ে সমস্যা। ভ্যান চালালে কী করে!'

'হেঃ হেঃ হেঃ মেমসাব–এইডা অইল আরেক হিস্টরি। আমার ডাইন পাওডা বায়েরডার চাইতে এট্টু খাড়া। হেঃ হেঃ হেঃ!'

মিথি বুঝতে পারল না, এর মধ্যে হাসির কী আছে!

'হেঃ হেঃ, সার, দেন– ব্যাগ দুইডা আমারে দেন, বলেই লোকটা যেদিক থেকে এসেছিল ব্যাগদু'ডা দু'হাতে নিয়ে সে দিকে রওনা হলো। 'হেঃ হেঃ, সার, আয়েন। আমার লগে লগে আয়েন, সার।'

লোকটার গমন পথের দিকে হাসান বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল। এও কি সম্ভব! ওই ব্যাগ দুইটা এত ভারী যে ট্রেন থেকে নামানোর সময় আরেক লোকের সাহায্য লেগেছিল। অথচ লোকটা অবলীলায় ব্যাগ দুইটা নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছে। যেন এটা কোন বোঝাই না।

'অবিশ্বাস্য!' মৃদু স্বরে বলে উঠল হাসান।

দুই

'হেঃ হেঃ হেঃ, সার আফনের টর্চ মারুন লাগতো না। এই সড়ক আমার চোউক্কের হামনে বাসতাছে। অ্যান্দারেই বালা দেহি। হেঃ হেঃ হেঃ।'

লোকটার কথা শুনে হাসান টর্চ নেভাল। পাশ থেকে মিথি তীব্রস্বরে বলে উঠল, 'না-না; টর্চ জ্বালাও। অন্ধকারে কখন কোন গাছের সাথে ধাক্কা খায়।'

হাসান আবার রাস্তায় টর্চের আলো ফেলল।

রাত ক্রমেই বাড়ছে। আকাশে তারা খুব একটা নেই। একফালি চাঁদ দেখা যাচ্ছে শুধু। মিথি এসব যতই দেখছে ততই মুগ্ধ হচ্ছে। মাঝে মাঝে রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ভেঙে দিচ্ছে খাটাস কিংবা শিয়ালের ডাকে। ঝিঁ ঝি পোকার এলোমেলো পথচলায় রাতের পরিবেশটা মিথির কাছে আরও সুন্দর লাগছে। রাতের এই পরিবেশে হাসান অভ্যস্ত হলেও মিথির কাছে অভিজ্ঞতা একেবারেই নতুন।

হাসান কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে অনেকটা সময় কাটানোর উদ্দেশ্যেই লোকটার সাথে কথা বলতে শুরু করল। 'আচ্ছা তোমার নামটা যেন কী?'

লোকটা ভ্যান চালাতে চালাতেই উত্তর দিল, 'হেঃ হেঃ হেঃ, আমার নাম হাসেম আলী। হগলে ডাহে হাসু। হেঃ হেঃ, জইন্মের হময় বইলে আমার কান্দুনডা হাসির লাহান লাগছিন।

হেঃ হেঃ, এ্যালাইগাই হগলে আমার নাম রাখছে হাসু। হেঃ হেঃ হেঃ।'

হাসান স্পষ্টই বুঝতে পারছে হাসুকে একটা প্রশ্ন করলে দশটা উত্তর দেয়। অবশ্য এখন শুনতে খারাপ লাগছে না। তবে পরে অবশ্যই খারাপ লাগবে। খারাপ লাগারই কথা। অতিরিক্ত কথা বলা লোক হাসানের একেবারেই সহ্য হয় না। লোকটাকে ধমক দিতে হবে কথা কম বলার জন্য তবে এখন না। পরে।

'শুনেছি, আমাদের আগের কেয়ারটেকারটার নাকি অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। তুমি কিছু জানো?'

'হেঃ হেঃ হেঃ, জাইনতাম না কেন?– বালামতই জানি। হেঃ হেঃ, রাইতের বেলায় একলা পিসাব কইরবার বাইরোছিন। কেয়া বলে হেরে মাইরা বুকমুক চিইড়া কইলজা খাইয়া আলাইছিন। একদিন বাদে লাশ পাওয়া গেছিন। হেঃ হেঃ, পিসাবটা শেষ কইরবার পায় নাইকা। হেঃ হেঃ হেঃ।'

'কইলজা খেয়ে ফেলেছে মানে?!'

'হেঃ হেঃ হেঃ, এইডা তো হগলেরই পরশ্ন। খাইলে তো হগল কিছুই খাইব, খালি কইলজা খাইব কেন? তয় আমার মন কয় যিডা খাইছে ওইডা খালি কইলজাই খায়।'

'লাশ একদিন পরে পাওয়া গেল কেন?'

'হেঃ হেঃ বাড়িত তো হে একলা থাকত। বউ বাফের বাড়িত গেছিন।'

'তা হলে তুমি জানলে কী করে সে পস্রাব করতে গিয়েছিল?'

'হেঃ হেঃ হেঃ, হেরে পিসাবখানার কাছাকাছি পাওয়া গেছিল কিনা হেল্যাইগ্যা। হেঃ হেঃ হেঃ।'

হাসান বুঝতে পারছে কলিজা– লাশ প্রসঙ্গ উঠতেই মিথি কেমন যেন ভীত হয়ে পড়ছে। সে দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টাল, 'তুমি,

আগে কী কাজ করতে?'

'হেঃ হেঃ, এইডা না হুনাই বালা। হগলে সউয্য কইরতে পায় না। হেঃ হেঃ তয় আফনেরা শহরের মানুষ, শিক্ষিত– হগলের লাহান না। আমি মানুষ কাডাছিড়ার কাম করতাম। হেঃ হেঃ হেঃ।'

হাসান চম্‌কে উঠল, 'মানে ?!'

'হেঃ হেঃ, হাসপাতালের ডোমের চাহরী, হেঃ হেঃ। লাশগরে ডাহতারের কতা মত লাশ কাটতাম, হেঃ হেঃ হেঃ।'

মিথি ঝট্ করে হাসানের দিকে তাকাল। হাসান চাঁদের আলোয় মিথির চোখের ভাষা বেশ ভালই বুঝতে পারল। মিথি যেন বলছে– 'তোমার আক্কেল দেখে আমি হতবাক্। এই রকম একটা লোককে তুমি কেয়ারটেকার বানিয়েছ?!'

হাসান জিজ্ঞেস করল, 'আগের চাকরিটা ছাড়লে কেন?'

'হেঃ হেঃ হেঃ, হাসপাতালে লাশের শইলের অনেক কিছু চুরি অইয়া যাইত। এল্লেগা ডাক্তর আঙ্গর হগলের চারহী নট্ কইরা দিছে। হেঃ হেঃ হেঃ।'

হাসান মিথির দিকে তাকাল। সাথে সাথে অবাক হয়ে গেল। এ কী! ভয়ে মেয়েটা ফোঁপাচ্ছে। হাসান ভ্যান থামাতে বলল। হাসু ভ্যান থামিয়ে অবাক হয়ে ওদেরকে দেখতে লাগল।

'হা-সা-আন পানি খা-ব।'

হাসান দ্রুত পানির বোতলটা বের করল। এহ্, হে! পানিতো ট্রেনেই শেষ হয়ে গেছে। বোতল খালি। হাসুর দিকে তাকাতেই হাসু বোতলটা ছোঁ মেরে নিয়ে বলল, 'কাছেই এডা কূয়া আছে। বালা পানি পাওয়া যায়। 'হেঃ হেঃ, আফনে বহেন, আমি লইয়া আইতাছি। হেঃ হেঃ হেঃ...'

হাসু জঙ্গলের ভেতর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল। এদিকে মিথি কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। হাসান মিথিকে সাহস দেয়ার জন্য বলল, 'তুমি এত বোকা ! এত ভয় পেলে হয়। আরে, মানুষই তো ডোমের চাকরি করে নাকি?

কথাটা বলার সাথে সাথেই কাছেই কোথাও থেকে হাসুর গলার স্বর শোনা গেল, 'হেঃ হেঃ হেঃ, স্যর, কূয়ার বালতিটা এট্টু দরুন লাগব। একলা বতুল বরুন যায় না। হেঃ হেঃ, স্যর, জলদি আইয়েন, আমি বালতি দইরা রাখছি। হেঃ হেঃ।'

হাসান মিথিকে ছেড়ে টর্চটা নিয়ে নামতে যাবে এমন সময় মিথি ওর হাতটা খপ্ করে ধরে ফেলল।

'না, তুমি যাবে না। আমি পানি খাব না।'

'আরে! পাগলামি কোরো না, লক্ষ্মীটি। পানি এখ্বন না লাগলেও পরে তো লাগবে। তুমি শান্ত হয়ে বসো। আমি এখনি আসছি।'

তিন

হাসান যাওয়ার কিছুক্ষণ পর একটা চিৎকার শুনেছে মিথি। কিন্তু বুঝতে পারছে না– এটা কীসের চিৎকার। একটা বিশ্রী সন্দেহ মনে উঁকি দিয়েছে বটে কিন্তু সেটাকে গুরুত্ব দিল না। ভয় আর আঁধার ওকে দারুণভাবে গ্রাস করে ফেলছে। দ্রুত ব্যাগ হতে অপর টর্চটা বের করে ফেলল। একা একা ভয় লাগছে। হাসান যেদিকে গেছে সেই মেঠো পথে পা বাড়াল মিথি। টর্চের অল্প আলোতে

চারদিকটা কেমন যেন অন্যরকম লাগছে মিথির। এ-এক ভিন্ন ধরনের রোমাঞ্চ। এখানে না আসলে এই অনুভূতিটা কখনোই বুঝতে পারত না মিথি। দু'ধারে প্রচুর নাম না জানা গাছপালা-ঝোপঝাড়। হঠাৎ সামনেই কী যেন একটা শব্দ শুনল মিথি। যেন কেউ কিছু একটা শব্দ করে খাচ্ছে। 'গজ-গজ-কচ-কচ-সরুপ-সরুপ। এ ধরনের একটা শব্দ। শব্দের উৎসের দিকে আলো ফেলতেই রক্ত হিম করা আর্তচিৎকার দিয়ে উঠল মিথি।

হাসান মাটিতে পড়ে আছে– আর বুকের উপর বসে হাসু লাল একটা মাংসপিণ্ড টেনে বের করে চিবিয়ে খাচ্ছে। হাসুর মুখমণ্ডল, কাপড়-চোপড় লাল রক্তে মাখামাখি। বীভৎস দৃশ্য! হাসুর মুখ থেকে লালার মত রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। টর্চের আলো ফেলতেই মিথির দিকে লোভাতুর চোখে তাকাল নরপিশাচটা।

'হেঃ হেঃ, মেমসাব, শুহুরের মাইনষের কইলজা, আফনে না খাইলে বুঝবেন না। হেঃ হেঃ হেঃ।'

কখন দৌড় দিয়েছে মিথি নিজেও জানে না। শুধু বুঝতে পারছে পেছনে নরপিশাচটাও আসছে। ধাওয়া করেছে ওকে। মিথি দৌড়াচ্ছে আর দু'চোখ দিয়ে অনবরত অশ্রু ঝরছে। বাবা-মার অতি আদরের সন্তান ও। কোনও দিন বাবা-মা কোনও কষ্ট দেয়নি ওকে। হাসানও ওকে খুব ভালবাসত। হাসানের কথা মনে আসতেই চোখের অশ্রু আরও দ্বিগুণ বেগে ঝরতে লাগল। হাসান, আমার হাসান। কোন দিন জানতে পারবে না ওর সন্তান এসেছে আমার গর্ভে। কোথা দিয়ে দৌড়াচ্ছে কিছুই বলতে পারবে না মিথি। পায়ের শক্তিও যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। আর দৌড়ানো সম্ভব না। চারিদিকে গাছপালা, মানুষের কোন চিহ্নমাত্রও নেই কোনদিকে। আর দৌড়াতে পারছে না ও। কিন্তু তবুও দৌড়াতে হবে। হাসানের সন্তানের জন্য দৌড়াতে হবে। বাঁচতে হবে

নরপিশাচটার হাত থেকে। কিন্তু বেঁচে কী হবে! হাসান তো আর নেই। হাসান, আমি তোমাকে খুব ভালবাসতাম।

হঠাৎ করে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মিথি। পেছনে কোনও শব্দ নেই। মাটিতে পড়া অবস্থায় পেছনে তাকাল মিথি। নেই, পেছনে কেউ নেই। নরপিশাচটা নেই। কিন্তু মিথি স্পষ্ট বুঝতে পারছে- পেছনে কেউ না থাকলেও সামনে কেউ একজন আছে। আস্তে আস্তে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে...।

আল-মারুফ

পাথরের দাঁড়কাক

'দেয়ার আর মোর থিংগ্স ইন হেভেন এন্ড আর্থ হোরাশিও, হুইচ ইজ বিয়ন্ড ইয়োর এক্সপেকটেশন,' এক মুখ সিগারের ধোঁয়ার সাথে কথাগুলো ছুঁড়ে দিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু লোকমান হোসেন। পেশায় ব্যবসায়ী, নেশায় শিকারী। বিগ গেম হান্টার। কথা হচ্ছিল তারই বাড়িতে– রাজধানীর অভিজাত এলাকায়। ছাড়া ছাড়া বাড়িগুলোয় নির্জনতা থাকলেও দারোয়ান, চাকরবাকর ও নাইটগার্ডের কমতি নেই। প্রশস্ত রাজপথে সারারাত মার্কারির আলো–দিনের আমেজ এনে দেয়। তবুও এর মাঝে সেই ঘটনা, যা বন্ধু লোকমানকে বিব্রত করে তুলেছিল।

কথা হচ্ছিল ওরই তেতলার বিশাল ড্রইংরুমে, কম্বাইন্ড হ্যান্ড মতলুব খানিক আগেই আমাদের সামনে ধূমায়িত কফির কাপ রেখে গেছে। সঙ্গে ক্রীমক্রাকার বিস্কুট। জানালার ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ড গোটানো। একটু আগেই সন্ধ্যা নেমেছে মৃদুমন্থর পাকে। পড়ি পড়ি করেও শীত এখনও পড়েনি। শেষ হেমন্তের কুয়াশা ইতোমধ্যেই রাস্তার বালবগুলোকে ঢেকে দিয়েছে আবছা সাদা চাদরে।

হলরুমের এককোণে মেহগনি কাঠের বিশাল শো-কেসের উপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়– 'পাথরের

দাঁড়কাক'। তা ছাড়া হলরুমের দেওয়ালে বাইসনের মাথা, বাঘের স্টাফ করা মুখ, চিতার ট্যান করা চামড়া ইত্যাদি এক নজরেই গৃহস্বামীর শিকারের নেশার পরিচয় দেয়। এই শিকারের মোহেই আমার বন্ধুটি অবিবাহিত রয়ে গেছে, যদিও বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে এখন।

যা হোক, প্রসঙ্গে ফিরে আসি। যত নষ্টের মূল ওই পাথরের দাঁড়কাক। কুচকুচে কালো রঙ। দুটো লালরঙের চুনী পাথর দিয়ে গড়া চোখ। প্রথম দর্শনেই মনে হবে ক্রূর তীব্র দৃষ্টিতে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে পাখিটা। মাস দু'য়েক আগে আসামের জঙ্গলে বুনো হাতি শিকার করতে গিয়ে কোন এক উপজাতীয় মন্দির থেকে তুলে এনেছিল লোকমান। শো-পিস হিসাবে সাজিয়ে রেখেছিল ড্রইংরুমে। দিনকাল নির্বিবাদেই বেশ কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে গতরাতে ঘটে গেছে ব্যাপারটা। রাত প্রায় দেড়টার দিকে কাঁচের শার্সিতে খস্ খস্ শব্দে ঘুম ভেঙে যায় লোকমানের। ভেবেছিল চোরটোর হবে হয়তো। সাহসী মানুষ, বিছানার ধারে রাখা লোহার রড নিয়ে চুপচাপ উঠে গিয়েছিল ড্রইংরুমে ব্যাপারটা দেখতে।

আওয়াজ আসছে ড্রইংরুমের পশ্চিমের জানালার ওপরে কাঁচের শার্সি থেকে। কে ধাক্কা দিচ্ছে ওপাশ থেকে। ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ড নামানো থাকায় ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না ব্যাপারটা। তবে ওধার থেকে রাস্তার আলো আসায় ছায়া ছায়া কী যেন একটা বস্তুকে দেখা গেল জানালার ফ্রেমে বসে থাকতে। লোকমান অবাক। ওদিকে সানশেড নেই– খাড়া দেওয়াল। কীভাবে তিনতলা পর্যন্ত উঠে এল ওটা? লোকমান দ্রুতহাতে ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ডটা তুলে দিতেই রাস্তার আলোয় যা দেখল, তাতে তার মত সাহসী মানুষও ভয়ে আর্তচিৎকার না করে পারেনি। দেখল বিশাল

এক হিংস্র দাঁড়কাক ডানা দিয়ে ঝাপ্টা দিচ্ছে কাঁচের শার্সিতে। তার লাল চুনীর মত চোখ দুটো জ্বলছে ক্রুদ্ধভাবে। লোকমানের চিৎকারে বিশাল ডানা বাতাসে ভাসিয়ে উড়ে গেল সেটা। মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

লোকমানের গতরাতের অভিজ্ঞতা মোটামুটি এই। তবে আমার কাছে তা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। কারণ বরাবর সন্ধ্যার পর 'জলপথে' ভ্রমণ করা তার অভ্যাস। হয়তো গতকাল মাত্রাটা বেশি হয়ে গিয়েছিল, তাই এই দৃষ্টিভ্রম! যা হোক, আমি বিষয়টাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিলাম না বলে লোকমান হয়তো ক্ষুণ্ন হলো। তবুও তাকে আশ্বাসবাণী শুনিয়ে পাথরের দাঁড়কাকটাকে ভালভাবে পরীক্ষা করে সেদিনের মত বিদায় নিলাম আমি। তবে সেই কালো পাথরের দাঁড়কাকটা, যার দুই চোখ মূল্যবান লাল চুনীখচিত, শিল্প হিসাবে অতুলনীয়– একথা আমি কেন, যে কেউ স্বীকার করবে সন্দেহ নেই।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই টেলিফোন পেলাম অফিসে। দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে লোকমান বাড়িতে। আমাকে বারবার দেখা করার অনুরোধ করল। তাই অফিস ছুটির পর একটা বেবীট্যাক্সী ধরে সরাসরি চলে গেলাম তার বাড়িতে। তিনতলায়, তার শোবার ঘরে পৌঁছে দেখলাম বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে সামনে স্কচের বোতল খুলে বসেছে। আমাকে বিছানায় বসেই অভ্যর্থনা জানাল– আয় জহির। একা একা খুব বোর ফিল করছিলাম।

'ঘটনা কী?' আমি আগ্রহ নিয়ে জানতে চাই।

'আর বলিসনে দোস্ত! ওই দাঁড়কাকটা– দ্যাট বাস্টার্ড– সেদিন রাতে সিঁড়িতে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল!'

'কে ফেলে দিয়েছিল?'

'ওই দাঁড়কাকটা।'

'বলিস কী?'

'হ্যাঁ, ক্লাব থেকে ফিরেছি রাত দেড়টার দিকে। লিফট অচল। সিঁড়ির বালবটা কয়েকদিন ফিউজ। কোন রকমে হাতড়ে হাতড়ে উঠছিলাম এমন সময় ছাদের খোলা দরজা দিয়ে জমাট অন্ধকারের স্তূপের মত ওটা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওটার ডানার ধাক্কায় গড়িয়ে পড়েছিলাম কয়েকটা সিঁড়ি। কনুইতে, কোমরে বেশ চোট পেয়েছি। তবে ভাগ্য ভাল, কোন ফ্রাক্চার হয়নি।'

'কী যা তা বকছিস! নিশ্চয়ই সেদিন আন ব্যালান্সড ছিলি। ক্লাবে গেলে তোর তো জ্ঞান থাকে না।'

'না রে দোস্ত, না। সেদিন খুব বেশি পান করিনি। তা ছাড়া যাই টানি না কেন, মাত্রা ছাড়িয়ে কখনও বেহুঁশ হইনি কোনওদিন। তা ছাড়া...'

'তা ছাড়া কী?'

'ওই বাস্টার্ডটা প্রতিরাতে জানালায় এসে আমাকে ভয় দেখায়। আজকাল হাতের গোড়ায় লোডেড বন্দুক রেখে দিই। গুলি করে শেষ করে দেব।'

লোকমানের কথাবার্তায় অসংলগ্নতার সুর ধরা পড়েছিল সেদিন।

এর মাসখানেক পরের ঘটনা। রাতে বাসায় লোকমানের টেলিফোন পেয়ে ছুটতে হলো আবার। গিয়ে দেখি মহা ঝামেলা বাধিয়ে বসে আছে। থানা পুলিশের ব্যাপার। রাত দশটার দিকে তিনতলার জানালা দিয়ে পর পর দু'তিনটে গুলি ছুঁড়েছিল সে। ফলে চারিদিকে হৈ চৈ। থানায় টেলিফোন যায় একের পর এক। সঙ্গে সঙ্গে একজন এস.আই পুলিশ নিয়ে আসেন এনকোয়ারিতে। এতক্ষণ লোকমানের স্টেটমেন্ট নেওয়া হচ্ছিল। আমি পৌঁছাতে আমারও স্টেটমেন্ট নেওয়া হলো।

লোকমানের সেই একই কথা, সেই দাঁড়কাক। অতিপ্রাকৃত ব্যাপার। যার কোন বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। সুতরাং এস.আই তাকে প্রথম বারের মত সতর্ক করে সদলবলে বিদায় নিলেন।

তিনি চলে যাওয়ার পর বিমর্ষ লোকমান আমাকে বলল, 'ব্যাপারটা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না, জহির। অথচ প্রতিরাতেই এটা ঘটছে।'

'ওটা তোর মনের ভুল। হ্যালুসিনেশনে ভুগছিস তুই। ভাল কোন ডাক্তার দেখা।'

'তুই বিশ্বাস করছিস না? অথচ গতরাতে ওটা জানালা ভাঙার চেষ্টা করছিল।'

'বলিস কী? তা হলে ওই অপয়া দাঁড়কাকটা রেখেই যখন তোর এই দুর্গতি, তখন ওটা বিক্রি করে দে বা যাদুঘরে দিয়ে দে।'

'তাও পারছি না। কেমন যেন নেশা ধরে গেছে ওটার উপর। একদিনও না দেখে থাকতে পারি না।'

'তা হলে এই ঝামেলা সহ্য করবি?'

'আর নয়! এবার গুলি মিস হবে না। শেষ করে ফেলব ওই অপচ্ছায়াটাকে।'

'যা খুশি কর!'

সেদিনকার মত বিদায় নিয়ে ফিরে এসেছিলাম। ধরেই নিয়েছিলাম পুরোমাত্রায় ড্রিঙ্ক করে ও নিজেই সব সময় ইলুশনে ভোগে। ফলে এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটা বিচিত্র কিছু নয়।

এর মাসখানেক পরের ঘটনা। লোকমানের জরুরী টেলিফোন পেলাম এবং সাথে সাথে দৌড়ালাম ওর বাড়ি। আমাকে যথারীতি সাদর অভ্যর্থনা করে ওর ড্রইংরুমে বসাল। কম্বাইন্ড হ্যান্ড মতলুব সন্ধ্যায় যথারীতি চা-নাস্তা পরিবেশন করল আমাদের। সান্ধ্য কফি

পান শেষে লোকমান সিগার ধরাল।

'কী ব্যাপার, হঠাৎ তলব?'

'আছে দোস্ত, কারণ আছে! এমনি তোকে আসতে বলিনি।'

'তোর সেই অলৌকিক দাঁড়কাকের খবর কী?'

'মাঝে মাঝে আসে। আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টাও করে। তবে আজকাল আমি ভয় পাই না। সবসময় হাতের কাছে লোডেড রাইফেল রাখি। বেটা বুঝতে পেরেছে। যা হোক, এই ডায়ারিটা পড়–মনে হয় আমি কাজটা ভাল করিনি।'

লোকমান ব্রিকরেড মলাটওয়ালা একটা ডায়ারি এগিয়ে দিল আমার দিকে। পাতায় ফ্ল্যাগ মার্ক করা। নির্দিষ্ট অংশটা পড়তে থাকলাম।

'...আদিবাসীদের যে গ্রামটায় আমি আতিথ্য নিয়েছিলাম, সেটি আসামের দুর্গম অঞ্চলে। উদ্দেশ্য হাতি শিকার। শুনেছিলাম এই অঞ্চলে এক দলছুট 'বদমাশ' হাতি যথেচ্ছ অত্যাচার করে বেড়াচ্ছে। মানুষজনও কয়েকজন মেরেছে। গ্রামপ্রধানের জংলা কুঁড়ে ঘরে দিনতিনেক কাটিয়ে দিলাম হাতির খোঁজে। শেষ দিন প্রচণ্ড ঝড়পানির রাতে দূর এক জংলী পোড়ো মন্দিরে আটকা পড়লাম। প্রচণ্ড পরিশ্রম ও ক্ষুধায় অবসন্ন, কাতর। শরীর চলে না। মন্দিরের দরজা বন্ধ। অনেক ধাক্কাধাক্কির পর দরজা খুলে দিল এক উদ্ভিন্নযৌবনা আদিবাসী দেবদাসী। মন্দিরের মিটমিটে আলোয় তার রূপযৌবন দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। মেয়েটি আমার ঝোড়োকাকের মত দীর্ণ বিধ্বস্ত চেহারা দেখে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাল। মন্দির সংলগ্ন ছোট্ট এক কুঠুরিতে আশ্রয় দিল। সামান্য ফলমূল, ছাগলের দুধ দিয়ে ইশারায় অতিথি সৎকারে কার্পণ্য করেনি সে। আমার খাওয়া শেষে দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে পড়ার ইঙ্গিত করে চলে গেল অন্য কোথাও।

ক্লান্ত শরীরে তখন রাজ্যের ঘুম নেমে আসার কথা। কিন্তু ঘুম এল না। বারবার সেই মেয়েটির যৌবন ডাক দিচ্ছিল চোখের সামনে। নিজেকে বহু চেষ্টা করেও বশে আনতে পারিনি আমি। বাইরে তখন ঝড়বৃষ্টি বজ্রের প্রচণ্ড দাপাদাপি– সেই দাপাদাপি আমার শরীরের স্নায়ুতে। পারলাম না কিছুতেই। চোরের মত পা টিপে টিপে ঘর থেকে মূল মন্দিরের ঘরে ফিরলাম। প্রদীপের ম্লান আলোয় দেখলাম আমার কামনার বস্তুকে। সে তখন মন্দিরের মেঝেতে চাটাই পেতে শুয়ে– গভীর নিদ্রামগ্ন। তারপর যা ঘটার তাই ঘটল। বাধা দিয়েছিল মেয়েটি; কিন্তু দুর্ধর্ষ শিকারী লোকমান হোসেনকে ঠেকানোর ক্ষমতা ছিল না তার।

ভোরের আলো ফোটার আগেই অজ্ঞান, অচেতন মেয়েটিকে ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছিলাম আমি। এবং আসার সময় কী ভেবে মন্দিরের বেদীতে রক্ষিত কালোপাথরের দাঁড়কাকটি আমার ঝুলিতে ভরে নিয়ে এসেছিলাম। দাঁড়কাকটির শিল্পসুষমা দেখে আমি লোভ ছাড়তে পারিনি– যদিও জানি এটি চুরি, এটি অন্যায়, এটি আমার জন্য অনুচিত কাজ।...

'কীরে, পড়লি সবটা?'

'হুঁ! কাজটা ভাল করিসনি দোস্ত!'

'জানি! তবে সে রাতে, সে অবস্থায় মাথার ঠিক ছিল না আমার। এখন মনে হচ্ছে ওটা ওভাবে না আনলেও চলত। হয়তো ওর সঙ্গে কোনও তন্ত্রমন্ত্র বা অভিশাপ জড়িয়ে আছে।'

'যাদুঘরে দিয়ে দে। ঝামেলার কী দরকার?'

'না। আমি এর একটা হেস্তনেস্ত দেখতে চাই। হয় ওটা থাকবে, নয় আমি।'

'আমি উঠি দোস্ত! রাত হয়ে যাচ্ছে।'

'এখনি? খেয়ে দেয়ে যাবি একেবারে। মকবুল হাঁসের ভুনা

খিচুড়ি করেছে। চমৎকার করে আইটেমটা। তোকে ড্রাইভার পৌঁছে দিয়ে আসবে– বসে থাক।'

লোকমানের অনুরোধ ঠেলতে পারলাম না। রাত দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ গল্পগুজব করে আমরা রাত এগারোটায় ডাইনিং টেবিলে বসলাম। একথা সেকথায় খাওয়া শেষ হলো রাত বারোটায়। পুনরায় ড্রইংরুমে কফি দিয়ে গেল মকবুল। লোকমান গাড়ি করে পৌঁছে দেবে– সুতরাং নিশ্চিন্ত ছিলাম।

এমন সময় ঘটল ঘটনাটা। দপ্ করে আলো চলে গেল সারা এলাকার। লোডশেডিং। শুধুমাত্র রাস্তার মার্কারি আলো জ্বলছিল। এবং সেই আলোয় দেখলাম অতিকায় কালোছায়ার মত একটা দাঁড়কাক সামনের জানালার চৌকাঠে বসে প্রচণ্ড পাখার ঝাপটা দিল কাঁচের শার্সিতে। ভয়ে প্রথমে আমি হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। পাশে শুনলাম লোকমানের দৃপ্ত কণ্ঠ, 'ইউ ডেভিল বাস্টার্ড! আজ তোকে খতম করবই।'

চোখের নিমিষে ঘটে গেল ঘটনাটা। সোফার পাশ থেকে লোডেড রাইফেল তুলে নিয়ে লোকমান সেই ছায়ামত দাঁড়কাকটাকে লক্ষ্য করে পর পর দুই রাউন্ড গুলি করে বসল। সাথে সাথে বিকট অপার্থিব ও ভয়ঙ্কর চিৎকার তুলে উড়ে গেল সেই ছায়ামূর্তি। অদৃশ্য হয়ে গেল আকাশের অন্ধকারে। ওদিকে পরপর দুই রাউন্ড রাইফেলের প্রচণ্ড শব্দ, জানালার কাঁচ ভাঙার আওয়াজ এবং সেই অপার্থিব রক্ত হিম করা আর্তনাদ– সব মিলে যে নারকীয় ঘটনা সৃষ্টি হলো; তার ফলে সাইরেনের বাঁশী বাজিয়ে পুলিশের গাড়ি ঢুকল পাড়ায়। শুরু হলো এনকোয়ারি। সেইসাথে জবানবন্দী নেওয়া হলো আমাদের। এনকোয়ারি শেষে রাইফেল সীজ্ করে নিয়ে গেল পুলিশ। পরদিন সকালে থানায় দেখা করার নির্দেশ দিয়ে গেল।

তারপর অনেক ঝুটঝামেলা গেল দুজনের উপর দিয়ে। লোকমান তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলায়, তাকে পাঠানো হলো মানসিক হাসপাতালে। সেই শেষবারের মত তার বাড়ি যেতে হয়েছিল আমাকে। ড্রইংরুমে রক্তাক্ত চুনীচোখের পাথুরে দাঁড়কাকটা দাঁড়িয়ে ছিল শো-কেসের উপর। দেখলাম তার বুকে গোল গোল সাদা দুটো স্পট–সম্ভবত নতুনই দেখলাম। আর তার লালচোখ দুটোয় বিদ্রূপের হাসি।

এহসান চৌধুরী

সিঁড়ি

বাড়িটা সুরভির খুব পছন্দ হয়ে গেল।

চমৎকার রেলিং ঘেরা টানা বারান্দা মেঝে পর্যন্ত লোহার গ্রিল দেয়া জানালা। ছাদে ওঠার ঝকঝকে সিঁড়ি। ছবির মত ব্যালকনি। জানালার কাছে দাঁড়ালে বিশাল দীঘি চোখে পড়ে। ফুরফুরে বাতাসে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। সুরভি বলেই ফেলল, 'বাড়িটা খুব চমৎকার।'

জয়নাল একটা নিঃশ্বাস ফেলল। বাড়িটা তার পছন্দ হয়নি। জানালায় গ্রিল থাকলেও ছাদে কোন রেলিং নেই। রেলিং নেই সিঁড়িতেও। বাড়ির একপাশে বিশাল পুকুর। অন্যপাশে রাস্তা। সারাক্ষণ গাড়ি-ঘোড়া চলছে। বাচ্চা দুটোর জন্যে বাড়িটা উপযুক্ত নয়। সুরভি তা বুঝতে পারছে না।

বাড়িওয়ালা অবশ্য বারবার বলেছে, আগামী মাসের মধ্যেই সিঁড়ি ও ছাদের রেলিং হয়ে যাবে। জয়নাল তার কথায় আশ্বস্ত হতে পারেনি। আশ্বস্ত হবার কথাও নয়। আশপাশের লোকজনের কাছে শুনেছে, বাড়িওয়ালা গত তিন বছর ধরে এই আশ্বাস দিয়ে আসছে সবাইকে।

বাড়িওয়ালার কথায় সুরভির কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। কারণ, বাড়িওয়ালার কথা তার কানেই ঢোকেনি। সে বারান্দায় ফুলের টব সাজানোয় ব্যস্ত। ওর চারপাশে ঘুরঘুর করছে পপি ও

রিমি। জয়নাল আরেকবার নিঃশ্বাস ফেলল। মেয়ে দুটো মায়ের মতই হয়েছে। একবার কোনওকিছু মাথায় ঢুকলে আর হুঁশ থাকে না। ভোগাবে, এরা তাকে প্রচুর ভোগাবে।

রাতে সবগুলো জানালা খুলে দিয়ে ক্যাসেট প্লেয়ার অন করল সুরভি। জনপ্রিয় হিন্দী গানের সুর বেজে উঠল। খোলা হাওয়ায় সুরভির চুল উড়ছে। সুরভি দাঁড়িয়ে আছে জানালার সামনে। জয়নাল বুঝতে পারছে না আশেপাশের লোকজনকে জোর করে হিন্দী গান শুনিয়ে কী লাভ। সে কিছু না বলে চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করল। সারাদিন খুব ধকল গেছে।

জয়নালকে অবাক করে দিয়ে পরের মাসে বাড়িওয়ালা ছাদের রেলিং-এর কাজ শুরু করল। সিঁড়ির কাজেও হাত দেয়া হলো। কাজ শেষ হতে হতে একমাসের কিছু বেশি সময় লেগে গেল। কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল অবিশ্বাস্য সব ঘটনা।

দিন তারিখ মনে নেই কারও। সময়টা ছিল বর্ষাকাল। সারাদিন বৃষ্টি হওয়ার পর একটুখানি ধরে এসেছিল কেবল। মেঘলা আকাশের কারণে বিকেলটাকে মনে হচ্ছিল সন্ধ্যা। অফিসের কাজে নারায়ণগঞ্জ গিয়েছিল জয়নাল। ফিরতে ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার সময় হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। তার মনে হলো কেউ একজন তার সঙ্গে উপরে উঠছে। সে জানতে চাইল, 'কে ওখানে?'

কেউ কোনও জবাব দিল না। জয়নাল পকেট থেকে লাইটার বের করল। জায়গাটা বেশি সুবিধার নয়। দিনে দুপুরেও চুরি ডাকাতি হয়। গত সপ্তাহেই পাশের বাড়ির ইসমাইল সাহেবের টু-ইন-ওয়ান চরি গেছে।

লাইটার জ্বালিয়ে কোনও কিছু পাওয়া গেল না। জয়নাল লাইটার নিভিয়ে ফেলল। তার মনের অস্বস্তি দূর হলো না। কালকেই বাড়িওয়ালাকে বলতে হবে সিঁড়িতে বাতি লাগানোর জন্যে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার উঠতে শুরু করল সে। সাথে সাথে সেই শব্দটাও শুনতে পেল আবার। একজোড়া পায়ের শব্দ। যেন কেউ সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসছে তার পেছনে পেছনে। একটা নিঃশ্বাসের শব্দও যেন শুনতে পেল। জয়নাল গলা চড়িয়ে দ্বিতীয়বারের মত জানতে চাইল, 'কে ওখানে?'

এবারও কোনও জবাব এল না।

পরের দিন বাড়িওয়ালাকে সবকিছু খুলে বলল জয়নাল। বাড়িওয়ালা হেসেই উড়িয়ে দিল। বলল, 'এ বাড়ির ত্রিসীমানায় কারও ঢোকার সাহস নেই। হয়তো অন্ধকারে বেড়াল-টেড়াল হাঁটতে শুনেছেন। আমি এখনই সিঁড়িতে বাতি লাগানোর ব্যবস্থা করছি।'

বাড়িওয়ালা সিঁড়িতে একশো পাওয়ারের বাল্ব লাগিয়ে দিল। জয়নাল পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারল না। তার মনে হতে লাগল, বাড়িওয়ালা কিছু একটা চেপে যাচ্ছে।

সেদিন দুপুর। জয়নাল বাসায় নেই। বাচ্চা দুটো গেছে স্কুলে। সুরভি একা একা শোবার ঘরে উপন্যাস পড়ছিল। দুপুরবেলার এই সময়টা ওর সহজে কাটতে চায় না। কেমন একঘেয়েমি লাগে।

পড়তে পড়তেই সুরভি টের পেল ঘরের ভেতর আলো কমে আসছে। চট্ করে ঘড়ির দিকে তাকাল ও। বেলা দুটো বেজে দশ। এ সময় আলো কমে আসার কোনও কারণ নেই। জানালা দিয়ে আকাশ চোখে পড়ছে। ঝকঝকে আকাশ। মেঘের

ছিটেফোঁটাও নেই। তা হলে?

আলো কমতে কমতে একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল কামরা। বইয়ের অক্ষর দূরের কথা, নিজের হাতও দেখা যাচ্ছে না। হতবাক সুরভি বাতি জ্বালানোর জন্য সুইচ টিপল। কিন্তু বাতি জ্বলল না। সম্ভবত কারেন্ট ফেইলিওর। সুরভি দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল।

বারান্দায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। ডানে-বাঁয়ে কোনও কিছু নজরে আসছে না। অনুমানের ওপর সামনে এগোল সুরভি। উদ্দেশ্য ড্রইংরুম। রিচার্জেবল ল্যাম্পটা ওখানেই।

এক ঝলক গরম বাতাস লাগল সুরভির চোখে মুখে। সেই সাথে অদ্ভুত একটা শব্দ শুনতে পেল। গোঙানির শব্দ। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল সুরভির।

কাজের ছেলে লিয়াকত বাজারে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে সিঁড়ির কাছে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে সুরভি। নাক-মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

'চোখের ভুল, নিশ্চয়ই চোখের ভুল,' জোর দিয়ে বলল বাড়িওয়ালা।

'কিন্তু দিনের বেলায় আলো কমে যাওয়া...'

'আকাশে মেঘ ছিল হয়তো।'

'ও যে বলল...'

'তিনি জানালা দিয়ে একদিকের আকাশ দেখেছেন, অন্য দিকের আকাশ দেখেননি।'

'গোঙানির শব্দ...' হাল ছাড়ল না জয়নাল।

'নিশ্চয়ই কোনও বাচ্চার কান্না।'

'অসম্ভব। বাচ্চা দুটো ছিল স্কুলে।'

বাড়িওয়ালা হাসল। 'আপনার বাচ্চা দুটো ছিল স্কুলে। কিন্তু

আশেপাশের সবগুলো বাচ্চা স্কুলে ছিল না। তাদের মধ্যেই কেউ...।'

'আমার মিসেস সুইচ টিপল, অথচ বাতি জ্বলল না।'

'কারেন্ট ফেইলিওর,' বলল বাড়িওয়ালা। 'ইদানীং প্রায়ই হচ্ছে।'

'সিঁড়ির গোড়ায় ছায়ামূর্তি দেখা...।'

'আপনাদের কাজের লোক, কী যেন নাম, মনে পড়েছে... লিয়াকত, ও-ই হতে পারে। আপনিই তো বললেন, ঘটনার পরপরই লিয়াকত এসে ঢোকে।'

'কিন্তু পেছন থেকে ধাক্কা দেয়া...।'

'ওনার ব্রেইন উত্তেজিত ছিল। এ অবস্থায় মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন।' পানের পিক ফেলল বাড়িওয়ালা।

বাড়িওয়ালার স্ত্রীর নাম নাসিমা আকতার। শ্যামলা, মোটাসোটা মহিলা। সারাক্ষণ পান খেয়ে মুখ লাল করে থাকে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। বাড়িওয়ালার স্ত্রীরা খুব অহঙ্কারী হয়ে থাকে বলে শোনা যায়। কথাটা ঠিক নয়। নাসিমা আকতার বেশ মিশুক ও হাসিখুশি মহিলা। প্রথম পরিচয়েই তাকে ভাল লেগে গেল সুরভির।

বাড়িওয়ালার তিন মেয়ে। কোন ছেলে নেই। দু'মেয়ের বিয়ে হয়েছে। সেই দু'জন স্বামীসহ বাহরাইন থাকে। প্রতি মাসে চিঠি লেখে। সবচেয়ে ছোট মেয়ে নীপা ইডেন কলেজে পড়ে। সেকেন্ড ইয়ার।

কথায় কথায় নাসিমা আকতার জানাল, একটি ছেলের খুব শখ ছিল তাদের। প্রচণ্ড শখ।

'সময় তো চলে যায়নি,' কিছু না ভেবেই বলল সুরভি।

নাসিমা আকতারের চেহারা কালো হয়ে গেল। এই পরিবর্তন

সুরভির দৃষ্টি এড়াল না।

'কী হয়েছে, ভাবী?'

'না, কিছু হয়নি।' নাসিমা আকতার উঠে গেল।

সেদিন বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে হঠাৎ ইলিয়াসের সাথে দেখা। জয়নাল প্রথমে চিনতে পারেনি। ইলিয়াসের মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ। সাইজেও প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। পেছন থেকে জয়নালকে জাপটে ধরল ইলিয়াস।

'আরে, দোস্ত! তুই?'

জয়নালের মুখ দিয়ে কথা সরল না। ইলিয়াস তার স্কুল জীবনের বন্ধু। দেখা হয় না প্রায় এক যুগ। মাঝখানে শুনেছিল ব্যাটা জার্মানী চলে গেছে।

'কোথায় আছিস এখন?' জানতে চাইল ইলিয়াস।

'একটা কনস্ট্রাকসন ফার্মে আছি। ফকিরাপুল। তুই?'

'বাসার ঠিকানা দে,' প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল ইলিয়াস।

ছোট্ট একটা কাগজে বাসার ঠিকানা লিখে দিল জয়নাল কাগজটার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে উঠল ইলিয়াসের।

'বাড়ির নাম কি তাহেরা মঞ্জিল?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'বাড়িওয়ালার নাম কি মুসা?'

মাথা ঝাঁকাল জয়নাল। 'এ.টি.এম. মুসা।'

'কতদিন ধরে আছিস ওখানে?'

'প্রায় দু'মাস। কেন?'

গলা খাদে নামিয়ে ফেলল ইলিয়াস। জয়নালের কানে কানে ফিসফিস করে বলল, 'পালা। পালিয়ে যা ওখান থেকে।'

ইলিয়াসের গলার মধ্যে এমন কিছু ছিল, গায়ের সমস্ত লোম

দাঁড়িয়ে গেল জয়নালের। সামলে উঠতে সময় লাগল তার।

'এ কথা বলছিস কেন?' জানতে চাইল সে।

অনেকক্ষণ ধরে হর্ন দিচ্ছিল একটা গাড়ি ওদের পেছন থেকে। এবার গাড়ির দরজা খুলে গেল। অল্প বয়সী একটা ছেলের চেহারা উঁকি দিল ভেতর থেকে। ব্যস্ত হয়ে উঠল ইলিয়াস।

'দেরি হয়ে যাচ্ছে, দোস্ত। আমি যাই।' গাড়ির দিকে রওনা হলো সে।

খপ করে ইলিয়াসের একটা হাত চেপে ধরল জয়নাল। 'ফুটানির জায়গা পাও না, না? কেবল অন্যের বাসার ঠিকানা নিয়েই খালাস?'

দাঁত দিয়ে জিভ কামড়ে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করল ইলিয়াস। বাড়িয়ে ধরল জয়নালের দিকে। বলল, 'সময় করে আসিস।'

'গাড়িতে ওরা কারা?

'বিজনেস পার্টনার।'

'অল্পবয়েসী ওটা কে?'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল ইলিয়াস। কিন্তু বলল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল গাড়ির দিকে। যেতে যেতে বলল, 'বাসায় আসিস। তোর বউকেও নিয়ে আসিস। তখন কথা হবে।'

সাঁই করে নাকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল ইলিয়াসের মিটসুবিশি জি এক্স। ভিজিটিং কার্ডের ওপর চোখ বুলিয়ে বোকা বনে গেল জয়নাল।

কার্ডটা ইলিয়াসের নয়, অন্য কারও। নিশানাথ চক্রবর্তী নামক একজন ভারতীয় আইনজীবীর নাম লেখা আছে। ঠিকানাটাও পশ্চিমবঙ্গের: ৪১ ফ্রী স্কুল স্ট্রীট. কলিকাতা। কোনও

সন্দেহ নেই, ভুল করে অন্য লোকের কার্ড ধরিয়ে দিয়েছে ব্যাটা।

হাঁটতে শুরু করল জয়নাল। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজটা দ্রুত সেরে ফেলতে হবে।

সপ্তাহে দু'দিন পপি-রিমিদের স্কুল থাকে না। সুরভির ভোগান্তি তখন বেড়ে যায়। বাচ্চা দুটোকে চোখে চোখে রাখাও একটা ভোগান্তি। যদিও সিঁড়িতে-ছাদে রেলিং লাগানো হয়েছে, কিন্তু বিপদের কি কোনও বাপ-মা আছে?

সমস্যা হলো লিয়াকত বাচ্চা দুটোকে একদম সামলাতে পারে না। ওদের ঘুম পাড়াতে গিয়ে নিজেই ঘুমিয়ে পড়ে। গতকাল মেয়ে দুটো লিয়াকতকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে ছাদে চলে গিয়েছিল। সুরভি এখনও শিউরে ওঠে ভাবলে। ভাগ্যিস ছাদে গিয়েছিল। যদি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যেত?

ছুটির দিনগুলোতে জয়নাল বাচ্চাদের সাথে নাস্তা করে। দুপুরেও একসাথে খায়। আজকের দিনটি ব্যতিক্রম। সে আগেভাগে বলে দিয়েছে দুপুরে ফিরবে না। তাই পপি-রিমি সকাল সকাল লাঞ্চ করতে বসেছে। সকাল সকাল লাঞ্চ করার পেছনে অন্য কারণও আছে। আজকে সুরভি ওদের নেপচুন থিয়েটারে নিয়ে যাবে। বাচ্চাদের জন্য একটা কমেডি ছবি এসেছে, খুব নাকি মজার।

ওদের জামা পাল্টে দিয়ে ইস্ত্রী করা নতুন জামা পরাল সুরভি। চুল আঁচড়ে দিল। তারপর নিজে কাপড় পাল্টানোর জন্য শোবার ঘরে ঢুকল। লিয়াকতকে বলল, ওদের নিয়ে ড্রইং রুমে খেলতে।

ড্রইং রুমে যেতে হলে সিঁড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে যেতে হয়। জায়গাটা পেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ পপি লিয়াকতের কানে কানে বলল, 'আমি তোমাকে ধাক্কা দিই?'

পপির বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল, রীতিমত চমকে উঠল লিয়াকত। ঢোক গিলে বলল, 'ধাক্কা দিলে পড়ে যাব তো, সোনামণি।'

'পড়ে গেলে অসুবিধা কী?' আহ্লাদী গলায় বলল পপি।

পড়ে গেলে অসুবিধা কী মানে? লিয়াকতের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। বলে কী হারামজাদী? লাফ দিয়ে সিঁড়ির কাছ থেকে সরে যেতে চাইল সে। কিন্তু পারল না। মনে হলো, কেউ তাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে ওখানে।

'পড়ে গেলে কোন অসুবিধা নেই,' সুর করে বলল পপি। ওকে সমর্থন করল রিমি। সে-ও তোতাপাখির মত বলল, 'পড়ে গেলে কোনও অসুবিধা নেই।' লিয়াকতের পেছনে এসে দাঁড়াল ওরা দু'জন। আছড়ে-পাছড়ে নিজেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল লিয়াকত। কিন্তু একচুল নড়তে পারল না। সাঁড়াশীর মত একজোড়া হাত পেছন থেকে ঝাপটে ধরল ওকে। এই হাত কার? পপির? রিমির? অসম্ভব।

লিয়াকত আয়তুল কুরসী পড়তে লাগল।

পেছন থেকে ফিসফিস করে কেউ বলল, 'কোন অসুবিধে নেই। তোমাকে ধরার জন্যে নীচে একজন দাঁড়িয়ে আছে, দেখো।'

সিঁড়ির দিকে তাকাল লিয়াকত। ঘাড়ের কাছে সবগুলো চুল দাঁড়িয়ে গেল ওর। ইয়া মাবুদ! ইয়া রাব্বুল আলামিন! ওটা কী? ওপরের দিকে উঠে আসছে ওটা কী?

পেছন থেকে একজোড়া হাত লিয়াকতকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল নীচে।

শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁক ছাড়ল সুরভি।

'পপি! রিমি! তোমরা কোথায়?'

কেউ কোন জবাব দিল না। মনে মনে লিয়াকতের মুণ্ডুপাত করল সুরভি। নিশ্চয়ই মেয়ে দুটোকে নিয়ে ছাদে চলে গেছে।

শোবার ঘরের ব্যালকনি থেকে ছাদের প্রায় সবটুকু দেখা যায়। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কাউকে দেখল না সুরভি। তবুও গলা চড়িয়ে আরেকবার ডাকল। প্রতিধ্বনি যেন ব্যঙ্গ করল তাকে।

কাঁপা কাঁপা হাতে কপালের ঘাম মুছল সুরভি। বুকের ভেতরটা ঢিব ঢিব করছে। কেউ কোনও সাড়া দিচ্ছে না কেন? লুকোচুরি খেলছে ড্রইং রুমে?

ড্রইং রুমে যাওয়ার পথে একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল ওর। দেখল, পপি ও রিমি সিঁড়ির গোড়ায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। মাথা দুটো ঈষৎ ঝুঁকে আছে সামনে। কী দেখছে ওরা? অমন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন? লিয়াকত কোথায়?

'এই, কী দেখছিস?' মেয়ে দুটোর কাঁধে হাত রাখল সুরভি।

কেউ কোন জবাব দিল না। সুরভির পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। মেয়ে দুটোর শরীর এমন শক্ত কেন? মনে হচ্ছে পাথরের গা। পলকহীন চোখে কী দেখছে ওরা সিঁড়িতে?

সুইচ টিপে সিঁড়ির বাতি জ্বালাল সুরভি।

নিশানাথ চক্রবর্তীর ভিজিটিং কার্ডের ওপর হাতে লেখা একটি টেলিফোন নম্বর পেল জয়নাল। অকূল সমুদ্রে যেন খড়কুটো পেল। হাতের লেখাটা ইলিয়াসের। কাজেই ফোন নম্বরটাও হয়তো ওর পরিচিত কারও। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে ওর নিজেরও হতে পারে।

টেলিফোন নম্বরটা ইলিয়াসের নয়। ইলিয়াসের কোনও বন্ধুরও নয়। একটি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির। তবে

কোম্পানিটি ইলিয়াসের সুপরিচিত। কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক গড়গড় করে ইলিয়াসের টেলিফোন নম্বর জয়নালকে জানিয়ে দিল।

টেলিফোন পেয়ে অনেকক্ষণ হো-হো করে হাসল ইলিয়াস। হাসি যেন থামতেই চায় না।

'তোর হাসি অসহ্য লাগছে,' ধমকে উঠল জয়নাল। 'দয়া করে থাম।'

'বিলিভ ইট অর নট, আজকে সন্ধ্যায় তোর বাসায় যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছিলাম।'

'চাপাবাজি রাখ।'

'ধানমণ্ডি গিয়ে টের পেলাম, তোকে ভুল করে অন্য কার্ড দিয়ে দিয়েছি।' আবার হাসতে শুরু করল ইলিয়াস।

'আমি রিসিভার নামিয়ে রাখছি,' বলল জয়নাল। 'তোর কথা অনুযায়ী তুই সন্ধ্যায় আমার বাসায় আসছিস। বউসহ। তখন বিস্তারিত আলাপ হবে।'

'জাস্ট এ মিনিট,' বলল ইলিয়াস। 'তুই যে বিষয়ে আলাপ করতে চাইছিস, তা ওই বাসায় করা যাবে না।'

'কেন?'

'পরে বলব।'

'কোথায় করা যাবে তা হলে?'

'তুই সোজা ধানমণ্ডি ২৮ নং রোড ধরে আয়। একদম সোজা। আমি তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি...।'

লিয়াকত মারা গেল একদিন পরে। ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছিল তাকে। ডাক্তারী রিপোর্টে বলা হলো: মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত মৃত্যু।

পুলিশ কয়েকদফা জেরা করল সুরভিকে। জেরা করল জয়নালকেও। কিন্তু কোনও কিছু উদ্ধার করতে পারল না। ছোট ছোট দুটি বাচ্চা ধাক্কা দিয়ে লিয়াকতকে ফেলে দিয়েছে– এটাও বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। পুলিশ তাদের ডায়েরীতে একটা ইউ.ডি. কেস লিখে রাখল।

'পুলিশ কিচ্ছু করতে পারবে না।' চায়ের কাপে চুমুক দিল ইলিয়াস। 'খামোকা সময় নষ্ট করবে।'

'কেন পারবে না?' জানতে চাইল জয়নাল।

'কারণ, এটা পুলিশের কেস নয়।'

'তা হলে? এটা কার কেস?'

'কার কেস বলতে পারব না। ভূত-প্রেত নিয়ে কারা ডিল করে আমি জানি না।'

'তুই কি আমার সাথে ইয়ার্কি করছিস?'

'ইয়ার্কি করব কেন?'

'ভূত-প্রেত বিশ্বাস করিস নাকি?'

'না।'

'তা হলে?'

'তোকে যতক্ষণ ধাক্কা দেয়নি, ততক্ষণ তুই ব্যাপারটা বুঝবি না। একবার ধাক্কা খেলেই বুঝবি ভূত-প্রেত বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস করার জন্য হাতে সময় কত কম থাকে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ,' জোর গলায় সমর্থন জানাল সুরভি। 'একদম সময় দেয় না।'

'কারা সময় দেয় না?' মহা বিরক্ত হলো জয়নাল।

'ওই…মানে…ওরা আর কী।' ইলিয়াসের দিকে আঙুল দেখাল সুরভি। 'উনি যাদের কথা বললেন।'

'বোকার মত কথা বোলো না। ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই।'

'আমাকে ধাক্কা দিল কে তা হলে?'

'তোমাকে কেউ ধাক্কা দেয়নি। তুমি এমনি এমনি পড়ে গেছ।'

'বাহ্! এমনি এমনি পড়ে যাব কেন?'

'কারণ, তোমার ব্রেইন উত্তেজিত ছিল।'

'জাস্ট এ মিনিট,' বলল ইলিয়াস। 'দেখা যাচ্ছে ওই সিঁড়ির কাছে এলেই সবার ব্রেইন উত্তেজিত হয়। বিষয়টা কী?'

'সবার কথা আসছে কেন?' ভুরু কুঁচকে তাকাল জয়নাল।

'তুই যখন সিঁড়িতে অশরীরী পায়ের আওয়াজ শুনেছিলি, তখন কি তোর ব্রেইন ঠিক ছিল?'

'ঠিক থাকবে না কেন?'

গলা ছেড়ে হাসল ইলিয়াস। 'তোর লজিক এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। একটু আগেই বলেছিস, ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই।'

কপালের ঘাম মুছল জয়নাল। তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে বয়স বেড়ে গেছে।

ব্যালকনিতে চেয়ার পেতে বসেছে ওরা। ডিনার সেরেছে একটু আগে। খোলা বাতাসে চুল উড়ছে তিনজনেরই। আকাশে গোল থালার মত চাঁদ। পূর্ণিমা না হলেও তার কাছাকাছি কিছু একটা হবে। কারেন্ট চলে যাওয়ায় বেশ ভাল লাগছে পরিবেশটা। একটা গ্রাম-গ্রাম ভাব চলে এসেছে। ধানমণ্ডির এই এলাকায় কারেন্ট চলে গেছে পনেরো মিনিট আগে।

সিগারেটের ছাই ঝাড়ল জয়নাল। 'তোর কি ধারণা, ওই সিঁড়িতে কিছু একটা আছে?'

মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল ইলিয়াস। 'ওসব বাদ দে। অন্য কিছু বল। তোদের বিয়ের গল্প বল। ভাবীর সাথে কি পূর্ব পরিচয় ছিল?'

'তুই সেদিন আমাকে ওই বাসা থেকে পালিয়ে যেতে বললি কেন?' হিস হিস করে বলল জয়নাল।

'এমনি বলেছিলাম।'

'মিথ্যে কথা। তুই কিছু একটা চেপে যাচ্ছিস।' ইলিয়াসের দিকে তর্জনী তাক করল জয়নাল। 'ওই সিঁড়ি সম্পর্কে কী জানিস বল।'

'ওই সিঁড়ি সম্পর্কে কিছুই জানি না। বিলিভ ইট অর নট।' জয়নালকে রেগে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি যোগ করল ইলিয়াস, 'তবে আমি একটা গল্প জানি। অদ্ভুত গল্প। তোর সিঁড়ির সাথে এটার কোন সম্পর্ক থাকতেও পারে। শুনবি নাকি?'

'বল।'

ইলিয়াস পায়ের ওপর পা তুলে বসল। 'তখন মাত্র বিয়ে করেছি। মেহেদীর আমেজ পুরোপুরি কাটেনি। ওই অবস্থায় চাকরি পেয়ে গেলাম একটা এনজিও-তে। অফিস ঢাকায়। বউ ফেলে রেখে জয়েন করতে চলে এলাম। সময়টা ছিল ১৯৮১ সাল।

ইলিয়াসকে থামিয়ে দিল জয়নাল। 'এ-ই তোর গল্প?'

'হ্যাঁ।'

'এটা তোর ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা। গল্প হবে কেন?'

'গল্প বলছি এ কারণে যে, আজ পর্যন্ত বহু লোকের কাছে এই ঘটনা বলেছি। পুলিশকেও বলেছি। কাউকে বিশ্বাস করাতে পারিনি। সবার ধারণা এটা গল্প। একটু পরে তোদেরও এই ধারণা হবে।'

'ঠিক আছে, বল।'

'নতুন নতুন বিয়ে করলে ছেলেরা বাসা থেকে বের-টের হয় না। সন্ধ্যা সাতটার পরে বাসায় মেহমান এলে বিরক্ত হয়। একটু

পর পর ঘড়িতে সময় দেখে। হাই তোলে। অফিসের টেলিফোন ঘনঘন এনগেজড পাওয়া যায়। আমার বেলায় সেরকম কিছু হলো না। সদ্য বিবাহিত একজন লোকের চাকরি জীবন শুরু হলো ব্যাচেলারের মত।'

সুরভি হাসি চাপতে গিয়ে বিষম খেল। জয়নাল বলল, 'তারপর? বউ নিয়ে এলি?'

ইলিয়াস হাসল। 'বউ নিয়ে এলে কি আজ তোদের বাবুর্চির রান্না খাওয়াই?'

'তা হলে?'

'সবকিছু ঠিকঠাক করে ওকে নিয়ে আসব, এ সময় ছোট্ট একটি ঘটনা ঘটল। সেই ঘটনাই হলো আমার গল্প।'

'এর সাথে সিঁড়ির কী সম্পর্ক?' জানতে চাইল জয়নাল।

'আছে, সম্পর্ক আছে। গল্প শুনলে বুঝতে পারবি। সিগারেট চলবে?'

'দে।'

সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল ইলিয়াস। নিজেও একটা নিল।

'ঢাকায় বাসা পাওয়া যে কী ঝক্কি তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। সস্তা দামের হোটেলে থাকি, সারাদিন অফিস করি আর সন্ধ্যাবেলায় বাসা খুঁজে বেড়াই। এরকম ঘুরতে ঘুরতে একদিন স্টেডিয়াম মার্কেটে নাসিমা আপার সাথে দেখা।'

'কার সাথে? নড়ে চড়ে বসল সুরভি।

'নাসিমা আপার সাথে। ভাল নাম নাসিমা আকতার। আপনাদের বাড়িওয়ালার স্ত্রী।'

'আগে থেকে চিনতেন?'

ইলিয়াস হাসল। 'নাসিমা আপা আমার দূর-সম্পর্কীয়

কাজিন। বয়সে দু'বছরের বড়। শৈশবের খেলার সাথী।'

'তারপর?'

'নাসিমা আপার সাথে আপনাদের বাড়িওয়ালা... কী যেন নাম...এ.টি.এম. মুসাও ছিল। লোকটাকে আগে দেখিনি। আমি থাকার জন্য বাসা খুঁজছি জানতে পেরে সে নিজেই জানাল সে বাসা ভাড়া দেবে। আমি বোকার মত রাজি হয়ে গেলাম।'

সিগারেটের ছাই ঝাড়ল ইলিয়াস। 'দু'নম্বর ভুলটা করলাম নাসিমা আপার সাথে মাখামাখি করে। নাসিমা আপা ছিল আমার বড় বোনের মত। আমি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি যে, এ.টি.এম. মুসা আমাকে সন্দেহ করছে।'

জয়নালের চোখের দৃষ্টি আরেকটু তীক্ষ্ণ হলো।

'একদিনের ঘটনা বলি। এ.টি.এম. মুসা গেছে টাঙ্গাইল। বাসায় নাসিমা আপা একা। কাজের ছেলেটি এসে খবর দিল নাসিমা আপার খুব জ্বর। আমি কোন কিছু না ভেবেই সিঁড়ি ভেঙে ওপরের দিকে ছুটলাম।

সিগারেটে লম্বা করে টান দিল ইলিয়াস।

'জ্বর ছিল ঠিকই, কিন্তু খুব বেশি ছিল না। আমি কাজের ছেলেটিকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে নাসিমা আপার পাশে বসলাম। একটা হাত রাখলাম কপালে। এই সময় এ.টি.এম. মুসা এসে ঢুকল।'

ব্যালকনিতে পিনপতন নিঃস্তব্ধতা। কারও মুখে কোনও কথা নেই।

'পরের মাসে নাসিমা আপার একটি ছেলে হলো। চাঁদের মত ফুটফুটে ছেলে। বেচারির খুব শখ ছিল ছেলের। বাড়িওয়ালারও। কিন্তু খুশি হতে পারল না কেউ। বাড়িওয়ালার চেহারা আবলুস কাঠের মত হলেও এই ছেলের গায়ের রঙ হলো ফরসা। চিবুকের

কাছে একটি তিল।'

অন্ধকারে নিঃশ্বাস নিল সুরভি। চাঁদের আলোয় ইলিয়াসের ফর্সা চেহারা চিকচিক করছে। তিলটাও।

'বছর না ঘুরতেই ছেলেটা মারা গেল। কীভাবে মারা গেল বলতে পারি না। শুনেছি হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি থেকে নীচে পড়ে গেছে।'

'তুই তখন কোথায়?' জানতে চাইল জয়নাল।

'অফিসে।'

'আর তোর বউ?'

'লালমনিরহাট।'

'লালমনিরহাট কেন?'

'ও তখন চাকরি করছে একটা স্কুলে। বেসরকারী স্কুল। চাকরির খুব শখ ছিল জোবেদার। আমিও না করিনি।'

সিগারেট নিভিয়ে ফেলল ইলিয়াস। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল।

'তারপর?' ধৈর্য হারিয়ে ফেলল সুরভি।

'তারপর কী হলো?' জানতে চাইল জয়নাল।

ঘড়ি দেখল ইলিয়াস। 'বাসায় যাবি না? রাত এগারোটা বাজে।'

'বাসার গোষ্ঠী উদ্ধার করি,' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল জয়নাল। 'তারপর কী হলো বল।'

'তারপর আর কী হবে? পরের সপ্তাহে অফিসের কাছাকাছি একটা ফ্ল্যাটে চলে এলাম। ফ্ল্যাট খালি হয়েছিল আগেই। কিন্তু তাহেরা মঞ্জিল ছেড়ে যাব কি-না সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না।'

ইলিয়াস জগ থেকে পানি ঢেলে ঢকঢক করে এক গ্লাস পানি খেলো। কারেন্ট চলে এল এ সময়।

'তাহেরা মঞ্জিলের সাথে ওটাই আমার শেষ সাক্ষাৎ।'

'নাসিমা আপার সাথেও?' জানতে চাইল সুরভি।

'নাসিমা আপার সাথেও।'

জয়নাল তীক্ষ্ণ চোখে ইলিয়াসের দিকে তাকাল। 'তোর কী মনে হয় না এটা একটা মার্ডার কেস?'

'মনে না হওয়ার কী আছে? এটা তো পানির মত পরিষ্কার।' ইলিয়াস আরেকটা সিগারেট ধরাল। 'মজার কথা কি জানিস? বাড়িওয়ালা আজ পর্যন্ত একবারও ছেলের কবর দেখতে যায়নি।'

'বলিস কী?'

'হ্যাঁ।'

'পুলিশকে জানিয়েছিলি?'

'না।'

'কেন?'

'ওখানেই তো সমস্যা। আমি যখনই পুলিশকে জানানোর জন্য থানায় যাই, আমার সাথে সাথে ওই ছেলেটাও যায়। পা জড়িয়ে থামানোর চেষ্টা করে।'

'কোন্ ছেলেটা?' চমকে উঠল জয়নাল।

'বাড়িওয়ালার সেই ছেলেটা!'

'মরা ছেলেটা?'

'হ্যাঁ।'

'অসম্ভব।'

'একটা কথা তখন বলা হয়নি। আমি যেদিন ওই বাসা ছেড়ে চলে আসি, আমার সাথে সাথে সেই ছেলেটাও চলে আসে।'

'অসম্ভব।'

'দিনের বেলায় মাঝে মাঝে ও বাড়ির সিঁড়িতে খেলতে যায়। লোকজনের সাথে মজা করে,' বলল ইলিয়াস। যেন জয়নালের

কথা তার কানেই ঢোকেনি। 'আবার রাতের বেলায় ফিরে আসে।'

'তোকে থানায় যেতে বাধা দেয় কেন?'

'ওর বিশ্বাস, মামলা হলে বাবার ফাঁসি হয়ে যাবে। তখন মা-কে কে দেখবে?'

জয়নাল স্তম্ভিত হয়ে গেল। ইলিয়াসের মাথা যে পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে, তাতে কোনও সন্দেহ রইল না।

'সে কি রোজ রাতেই এখানে আসে?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ।'

'আজ আর আসবে না, তাই না?' জয়নালের গলায় বিদ্রূপ।

ইলিয়াস শব্দ করে হাসল। 'আমি গোড়াতেই বলেছি আমার এই গল্প কেউ বিশ্বাস করে না। তোরাও করবি না। যদি ছেলেটিকে এনে হাজির করি, তা হলেও না।'

'কেন?'

'আগেও বহু লোকের সামনে তাকে হাজির করেছি। কোনও লাভ হয়নি। ওরা তো বাড়িওয়ালার মরা ছেলেটাকে দেখেনি। কী প্রমাণ আছে এই ছেলেই সেই ছেলে?'

সুরভি হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। 'আমি দেখেছি। আমি চিনতে পারব। তাকে হাজির করুন।'

জয়নাল আশ্চর্য হয়ে গেল। 'কোথায় দেখেছ?'

'নাসিমা আপার কামরায়,' বলল সুরভি। 'দেয়ালে টাঙানো ছবিতে।'

ইলিয়াস আবারও হাসল। যেন খুব মজা পেয়েছে।

'তাকে তো আপনি একটু আগেই দেখেছেন। চিনলেন না কেন?'

'কোথায়?' চমকে উঠল সুরভি।

'একটু আগে যে সিগারেট দিয়ে গেল?'

খানিকক্ষণ কেউ কোনও কথা বলতে পারল না।

'অন্ধকার ছিল.' অবশেষে বলল সুরভি। 'এখন কারেন্ট এসেছে। ব্যালকনির বাতিটা জ্বালান। তারপর ডাকুন।'

ব্যালকনির বাতিটা জ্বালাল ইলিয়াস। তারপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাকে যেন ডাকল।

সময় দাঁড়িয়ে গেল স্তব্ধ হয়ে।

সিঁড়ি বেয়ে একজোড়া কচি পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে।

শাহেদ ইকবাল

নিমন্ত্রণ

ঘটনাটি আমার এক বন্ধুর মুখ থেকে শোনা।

তাদের গ্রামের নাম নোয়াগাঁও। মাঘ মাসের এক কুয়াশাঘেরা রাতে সেই গ্রামের মেঠো পথ ধরে হাঁটছিল সে। কুমিল্লা থেকে যাবার আগে সে আমাকে নিমন্ত্রণ করে যায় তাদের গ্রামে যাবার জন্যে। অফিসে যথেষ্ট ছুটি পাওনা ছিল আমার। তাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম, ঠিক এক সপ্তাহ পর তাদের বাড়িতে বেড়াতে যাব আমি। সে রাজি হয়েছিল।

বাজারে গিয়েছিল সে। আজই এসে পৌঁছেছে কুমিল্লা থেকে। পরিচিত অনেকের সাথেই দেখা হয়েছে। কল্যাণের চায়ের দোকানের আড্ডায়ও যোগ দিয়েছিল। কয়েকজন ওর জন্য আফসোস করেছে– আর কিছুদিন আগে এলেও নাকি 'রসের বাইদানী' পালাটি দেখতে পেত। এরপর চলেছে তাসের আসর। মোটামুটি ভালই কেটেছে সময়। অনেক নতুন পুরাতন খবর শুনেছে। আসবার সময় কল্যাণ আবার দু'টি সিগারেটও গছিয়ে দিয়েছে হাতে।

বাড়ি থেকে বাজার তিন মাইলের পথ। ঠিকমত হাঁটতে পারলে এক ঘণ্টাও লাগে না। কিন্তু শীতের রাত্রে অনেকক্ষণ লেগে যায়।

হাঁটছে সে। গাঁয়ের এ পথটা একটু নির্জন। অসময়ের বৃষ্টি হয়েছে এক পশলা। এখানে সেখানে পানি জমে আছে। এঁটেল মাটির রাস্তা, কাদা হয়ে আছে। কাদায় ওর স্যান্ডেল দেবে গেল। টেনে উঠাল। তারপর পাশের ভেজা ঘাসে স্যান্ডেল ঘষে নেবার জন্যে উবু হতেই ঘটল ব্যাপারটা। কে যেন ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলল। শীতল দীর্ঘশ্বাস। যেন কারও বুক থেকে বিশাল পাথর নেমে গেছে। পাব কি পাব না, এরকম একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে হঠাৎ পেয়ে যাওয়ার ফলে সুখের একটা নিঃশ্বাস।

তবে তার জন্যে ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই সুখকর ছিল না। বরং গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ঝট করে মাথা তুলল বিষ্ণু– আমার বন্ধু। এদিক ওদিক তাকায়– নাহ্, কিছু নেই তো, কিছুই নেই। স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়ায় আবার। শিস দিতে দিতে, আকাশের তারা গুনতে গুনতে যাচ্ছে সে, হঠাৎ নীচের দিকে তাকাতে দেখল ছোট সাদা একটা বেড়াল ওর পায়ের ঠিক একহাত সামনেই শুয়ে আছে। ওর মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি খেলে যায়। ছোট বেলার বদ অভ্যাসটা যায়নি। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বিষ্ণু। আলতো করে সাদা কালোয় ডোরা কাটা লেজের আগাটা ধরল, পুরোটা নয়। কয়েকটা লোম মাত্র। তারপরই মারল হ্যাঁচকা টান। 'ম্যাও' করে দাঁড়িয়ে গেল বেড়ালটা। একবার বিষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল বিষ্ণুর দিকে। তারপর সোজা রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করল। আকাশের দিকে তাকিয়ে একবার হেসে ওঠে বিষ্ণু। তারপর আবার সামনে তাকায়। নেই বেড়ালটা। আশ্চর্য, এত তাড়াতাড়ি চলে গেল! একটু অবাক হয়ে আবার হাঁটা দেয়।

সামনের বাঁক পেরোলেই পড়বে পুরানো ভাঙা কালী মন্দিরটা। তার পাশেই কালীপুকুর, জানে ও। হঠাৎ কী খেয়াল হতেই মনে মনে মা কালীকে স্মরণ করতে লাগল। ওর বাবা বিশ্বাস করতেন, মা কালী নাকি পুরানো মন্দিরের পাশ দিয়ে যাওয়া একলা পুরুষ পথিককে দেখা দেন। নিজ হাতে স্বামী হত্যার অপরাধবোধের কারণেই খুব সম্ভব, পুরুষ পথিকদের অমূল্য বর দেন। তার বাবা এ আশায় সারা জীবনই মন্দিরের আশেপাশে কাটিয়েছিলেন। তবে বোধহয় বর পাননি। পেলে মৃত্যুর সময় তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক তিন সন্তানের জন্যে নিশ্চয়ই শুধুমাত্র একটি কুঁড়েঘর এবং মাটির ব্যাঙ্কে জমানো আড়াইশো টাকা রেখে যেতেন না।

কালী মন্দিরটা চোখে পড়তেই বিষ্ণু প্রণাম করল। এদিক ওদিক তাকাল মা কালীর খোঁজে। তখনই দেখল, পুকুর ঘাটে কে যেন বসে আছে। আরেকটু এগোল সে। আরে, বিমলদা না? বিমলদা-ই তো! সেই শাল, সেই বাবরি চুল, স্বল্প আলোয় ঘাড়ের দাদের সাদা দাগগুলোও স্পষ্ট। বিমলদার দিকে এগিয়ে যায় বিষ্ণু।

পাঠক, আমার বিশ্বাস– আমার এই অতীব বুদ্ধিমান বন্ধু বিষ্ণু যদি কল্যাণের দোকানে বসে গল্পের ছলে বলা কালীপুকুরে ডুবে বিমলের মৃত্যুর খবরটায় একটু মনোযোগ দিত তবে ও এভাবে এগিয়ে যেত না।

কিন্তু নিয়তি ঠেকাবে কে? নিয়তি তাকে টেনে নিয়ে গেল বিমলের কাছে। সেই নিয়তিই আবার তার মুখ দিয়ে বলাল, 'কেমন আছ, বিমলদা?'

বিমল ঘাড় ফেরাল। বিষ্ণু লক্ষ করল সেই আগের মতই আছে বিমলদা। সেই চেহারা, সেই নাক, মেয়েদের মত সেই

পাতলা ঠোঁট। কিন্তু চোখ দু'টি কেমন যেন নিষ্প্রাণ বলে মনে হয়। ছমছমে গলায় বিমল বলে ওঠে, 'আয়, বস। কখন এসেছিস?'

'এই তো আজই,' বলে বসে পড়ল বিষ্ণু বিমলের পাশে।

দু'জনে গল্প করতে লাগল। ছোটবেলার গল্প; কত মজারই না ছিল সেসব দিন। চেয়ারের পায়ায় লেগে বিপিন স্যারের ধুতি খুলে যাবার কথা মনে করে পেট চেপে হাসতে লাগল দু'জন। শেষ মুহূর্তে হাত দিয়ে গোলপোস্টে বল ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেদের দলকে জিতিয়ে দেয়ার আনন্দ স্মৃতিও রোমন্থন করল।

এক সময় হঠাৎ বিমল বলে উঠল, 'চল, বিষ্ণু, চান করি।'

বিমলের প্রস্তাবে অবাক হয়ে গেল বিষ্ণু। 'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে বিমলদা, এখন স্নান করবে? এই শীতে?'

'আরে ধ্যুৎ, আয় তো!' বলে বিষ্ণুর হাত ধরে টান দিল বিমল। বিষ্ণু অনুভব করল একটি বরফ শীতল হাতের স্পর্শ।

পাঠক, এর ঠিক এক সপ্তাহ পর এই রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বিষ্ণু আমাকে বলেছিল এই ঘটনা। বলেছিল তার পরদিনই নাকি লোকে কালীপুকুরে ওর লাশ খুঁজে পায়। ফুসফুসে পানি ঢুকে মারা গিয়েছিল সে

ওর গল্প এখানেই শেষ।

কিন্তু আমার নয়।

আমি এখন বহুরাত ধরে অপেক্ষা করছি, আমার গল্পটা কাউকে শোনাব, কেউ শুনতে আসবে, এমনই কোন কুয়াশা ঘেরা শীতের রাতে, একা, কালীপুকুরের ঘাটে বসে তাকে শোনাব আমি আমার গল্প।

আসবেন নাকি আপনি?
আসুন না একবার। মাত্র একটি বার…।
আমার নিমন্ত্রণ রইল।

নূরুল হাসান

চোখের আড়াল হলে

ঘটনাগুলো এখনও আমাকে দুঃস্বপ্নের মত তাড়া করে ফেরে। ভুলে থাকার চেষ্টা করি। পারি না। কী করেই বা ভুলে থাকব? মাথার উপর দিয়ে অনবরত বিমান উড়ে গেলে কীভাবে ভুলে থাকা যায়? যতবার বিমানের গর্জন কানে আসে ততবার সেই আতঙ্কের কথা মনে পড়ে আমার। কাঁপতে থাকি থরথর করে। ভয়ে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে পড়ে, ঘামে ভিজে যায় সমস্ত শরীর। কানে ভেসে আসে ইঁট, কাঁচ, পাথর ভাঙার শব্দ– আর আমার মেয়ের আর্তনাদ। সেই আর্তনাদ কেবল শুনতে পাই আমি। তখন আমার সব মনে পড়তে থাকে– ব্যাখ্যাতীত, রহস্যময় ঘটনাগুলো।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল মিসেস বার্নেসের পেরামবুলেটর দিয়ে. আমার মেয়ে জেনিকে নিয়ে সেদিন দোকান থেকে ফিরছি। হঠাৎ আমার হাতটা চেপে ধরল ও। তারপর আঙুল তুলে দেখাল রাস্তার ওপারটা। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল. 'মা দেখো– প্রামটাকে দেখো।'

তাকালাম আমি। দেখলাম পেরামবুলেটরে বসে আছে আমাদের প্রতিবেশী মিসেস বার্নেসের বাচ্চা, আর মিসেস বার্নেস দু'হাতে পেরামবুলেটর ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছেন বাজারের

দিকে।

'ও তো রোজই দেখো,' বললাম আমি। 'নতুন করে আর দেখার কী আছে?'

'কিন্তু রোজ তো মিসেস বার্নেসই ওটা ঠেলে নিয়ে যান,' বলল জেনি। 'অথচ আজ দেখো গাড়িটা কেউ ঠেলছে না। আপনাআপনি চলছে।'

'বাজে বোকো না,' বিরক্তি চেপে রেখে বললাম আমি।

'মোটেই বাজে বকছি না,' জেনি বলল। 'দেখছ না মিসেস বার্নেস ওখানে নেই। বাচ্চাটাকে নিয়ে প্রামটা নিজেই চলছে।'

ইদানীং জেনির মনটা ভাল নেই, জানি আমি। খুব উল্টোপাল্টা কথা বলছে ও। বুঝতে পারি নিঃসঙ্গতার জন্যেই এমনটা হয়েছে। এখানে ওর কোন বন্ধু বান্ধব নেই। সারাক্ষণ একা থাকে মেয়েটা। একটাই মাত্র মেয়ে আমাদের। আমিও খুব একটা সময় দিতে পারি না ওকে, ওর বাবার কথা তো বাদই দিলাম। তাই হয়তো এসব উল্টোপাল্টা কথা বলে মজা পায় ও। কয়েকদিন আগে ওর বাবার শার্টটা নিয়ে একই কাণ্ড করেছিল। সেদিন সকালে সাদা রঙের শার্ট পরে বেরিয়েছিল ওর বাবা। অথচ জেনি বলল, 'বাবা সবুজ রঙের শার্ট পরে গেল কেন?' আমি যতই বলি, তোমার বাবা সাদা শার্ট পরে গেছে, জেনি ততই বলতে থাকে– বাবা সবুজ শার্ট পরে গেছে। এক সময় ওকে বললাম, 'তোমার বাবার তো সবুজ শার্টই নেই।' জেনি মানল না আমার কথা। বলল, 'অবশ্যই আছে। নইলে সবুজ শার্ট পরল কেমন করে?'

সেদিন এই নিয়ে এক ঘণ্টা ধরে তর্ক করেছিল জেনি। এখন আবার শুরু করেছে মিসেস বার্নেসের পেরামবুলেটর নিয়ে। বাড়ি পৌঁছেও সেই একই ঘ্যানঘ্যানানি। 'মা সত্যি বলছি, প্রামটা নিজে

নিজে চলছিল তখন।'

'বোকার মত কথা বোলো না,' এবার সত্যিই রেগে গেলাম আমি। 'মিসেস বার্নেস না ঠেললে গাড়িটা চলবে কী করে?'

'তা হলে বোধহয় কম্পিউটার চালাচ্ছিল ওটাকে,' উত্তর দিল জেনি।

'অনেক হয়েছে, এবার থামো,' ইতি টানতে চাইলাম আমি।

জেনি বলল, 'তুমি বোধহয় বাবার শার্টের ব্যাপারটা ভুলতে পারছ না। স্বীকার করছি মিথ্যে বলেছিলাম আমি। বাবা সাদা শার্টই পরেছিল। কিন্তু মিসেস বার্নেসের ব্যাপারটা– তুমি তো দেখলে তিনি ওখানে ছিলেন না।'

'অবশ্যই ছিলেন।'

'ঠিক আছে, আমি জানালার কাছে বসে রইলাম। প্রামটা যখন ফিরবে তোমাকে ডেকে ভাল করে দেখাব।'

জানালার চৌকাঠে উঠে বসল জেনি। আমি রান্নাঘরে ঢুকলাম। কাজের চাপে ভুলে গেলাম জেনি ও প্রামটার কথা। অনেকক্ষণ পর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দেখি তখনও জানালায় বসে আছে জেনি। 'খেতে এসো,' ওকে ডাকলাম আমি।

'এখনও ফেরেনি,' জেনি বলল কাছে এসে।

'কে ফেরেনি?'

'প্রামটা মনে হয় পথ হারিয়ে ফেলেছে।'

'চিন্তা কী, মিসেস বার্নেস ওটা খুঁজে বের করে আনবেন,' পরিহাসের ছলে বললাম আমি। 'এতক্ষণে হয়তো খুঁজতেও বেরিয়েছেন।'

'না, তিনি বেরোননি,' বলল জেনি। 'আমি চোখ রেখেছিলাম তাদের দরজায়। তা হলে এখনও ওটা ফিরছে না কেন বুঝতে পারছি না। লাঞ্চের সময় হয়ে গেল।'

'তা হলে বোধহয় তিনি বাচ্চাটাকে নিয়ে কোন বন্ধুর বাড়িতে গেছেন লাঞ্চ খেতে।'

'এখনও আমার কথা বিশ্বাস করছ না তাই না?'

'এটা নিয়ে এখন গল্প লিখতে বসো। চমৎকার গল্প হবে।'

'মা, এটাকে গল্প বলছ কেন? এটা তো সত্যি।'

সন্ধ্যায় শুয়ে পড়ল জেনি। হ্যারল্ড, আমার স্বামী, বাসায় ফেরার পর আমাকে ডেকে নিয়ে বলল, 'তুমি তো মিসেস বার্নেসকে চেনো। রাস্তার ওপাশের সুন্দরী মহিলাটা।'

'চিনব না কেন! ওর কথা শুনতে শুনতে আজ কান ঝালাপালা হয়ে গেল।'

'আজ সকালে বড় রাস্তাটার ওপর গাড়ির নীচে চাপা পড়েছিলেন তিনি,' বলল আমার স্বামী। 'রাস্তা পার হয়ে প্রামটা সবে ফুটপাথে তুলতে যাবেন, এমন সময় ওটা কীসে যেন বেধে যায়। মিসেস বার্নেস তখন রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাস্তা দিয়ে সে সময়ে খুব জোরে একটা গাড়ি আসছিল। সময় মত থামতে পারেনি। মিসেস বার্নেসকে চাপা দিয়ে চলে যায়। সাথে সাথে মারা গেছেন ভদ্র মহিলা।'

ঠাণ্ডা হয়ে এল আমার শরীর। 'এজন্যেই তাকে ফিরে আসতে দেখা যায়নি। জেনি সারাটা দিন পথের দিকে চেয়েছিল। বাচ্চাটা কেমন আছে?'

'ওর কিছু হয়নি। কিন্তু জেনি পথের দিকে চেয়েছিল কেন?'

ঘটনাটা খুলে বললাম ওকে। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'মৃত্যু সংবাদটা ওকে জানাই, কী বলো? খুব ভেঙে পড়বে বেচারি।'

'হ্যাঁ জানাও,' বলল হ্যারল্ড। 'ভবিষ্যতে যাতে আর কাউকে নিয়ে রসিকতা করতে না পারে, সেই শিক্ষাটা হবে।'

'বারে, ওকে দোষ দিচ্ছ কেন? ও কীভাবে জানবে! থাক,

ওকে জানানোর দরকার নেই।'

মিসেস বার্নেসের ঘটনা ওকে জানালাম না। পরদিনও হয়তো জানাতাম না। কিন্তু জেনি আবার শুরু করল ঘ্যানঘ্যানানি। 'মা, গতকাল প্রামটা ফিরেছে কিনা জানো?'

বাধ্য হয়ে খবরটা দিলাম তাকে। 'মিসেস বার্নেস কাল প্রামটাকে নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন– মনে আছে তো? আগে বলতে দাও আমাকে। খুবই দুঃসংবাদ। একটা গাড়ির নীচে চাপা পড়েছিলেন তিনি। মিসেস বার্নেস মারা গেলেও নিরাপদেই আছে বাচ্চাটা।'

'মিসেস বার্নেস মারা গেছেন!'

'হ্যাঁ, জেনি। খুব দুঃখজনক ঘটনা।'

'কীভাবে হলো?'

হ্যারল্ড আমাকে যেটুকু বলেছিল সেটুকু বললাম আমি। মনোযোগ দিয়ে শুনল জেনি। শান্ত গলায় বলল, 'তিনি নিশ্চয় বাড়ি থেকে আগেই বেরিয়ে গিয়ে প্রামটার জন্যে ওখানে অপেক্ষা করছিলেন। হলপ করে বলতে পারি প্রামটাকে নিয়ে তিনি বের হননি।'

আর কিছু বললাম না আমি। স্বস্তিবোধ করলাম মৃত্যুসংবাদ শুনে সে ভেঙে পড়ল না দেখে। সেও আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না এরপর।

কয়েক সপ্তাহ পরে স্কুলে একটা ঘটনা ঘটাল জেনি। ওর এক টীচারের রয়েছে মাকড়সা আতঙ্ক। জেনি সেই টীচারের ডেস্কে একটা মাকড়সা রেখে দিল। জেনির নামে হেডমিস্ট্রেসকে নালিশ করলেন টীচার। জেনি আমাকে বলে গেল, 'হেডমিস্ট্রেস চারটের সময় দেখা করতে বলেছেন আমাকে। ফিরতে তাই দেরি হবে।'

কিন্তু তাড়াতাড়িই বাসায় ফিরল জেনি। বললাম, 'তোমার

হেডমিস্ট্রেস তো দেখছি খুব তাড়াতাড়িই তোমাকে ছেড়ে দিলেন।'

হাসল জেনি। 'ভাগ্য ভাল যে তিনি ছিলেনই না। চারটের সময় তাঁর রুমের সামনে গেলাম। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দরজায় টোকা দিলাম। একবার মনে হলো তিনি ভেতরে ঢুকতে বলছেন। কিন্তু ঢুকে দেখলাম রুমে কেউ নেই। মনে হয় আমার কথা ভুলেই গেছেন তিনি। কী সৌভাগ্য।'

'কাজটা ঠিক করোনি,' বললাম আমি। 'তোমার উচিত ছিল ওখানে অপেক্ষা করা।'

'আর সেধে পড়ে মার খাওয়া, তাই না?'

পরদিন স্কুলের সেক্রেটারি মিসেস লেনিং এল আমাদের বাড়িতে। কেমন যেন শুকনো দেখাচ্ছিল তাকে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম তার দিকে।

'দুঃসংবাদ আছে,' বলল মিসেস লেনিং। 'কাল রাতে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন হেডমিস্ট্রেস মিস পেট্রেল। এখনও কেউ জানে না খবরটা। যে মেয়েটা ঘর ঝাড়ু দেয়, সকালে সেই প্রথমে দেখতে পায় লাশটা। বিছানায় পড়ে আছে। আমি ছাড়া তাঁকে জীবিত অবস্থায় শেষ দেখেছে আপনার মেয়ে জেনি।'

'জেনির সঙ্গে গতকাল চারটের সময় দেখা করার কথা ছিল তাঁর—'

'তা জানি,' বলল মিসেস লেনিং। 'কিন্তু জেনি তো ভয়েই পালিয়ে গেল। অফিসে বসে দেখলাম জেনি মিস পেট্রেলের দরজায় টোকা দিল। ভেতরেও ঢুকল কিন্তু সাথে সাথেই ছুটে বেরিয়ে এল আবার। দেখা করতে গেলাম আমি মিস পেট্রেলের সাথে। উনি বললেন, 'জেনি তাঁর দিকে একবার তাকিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেছে। দুঃখ করে মিস পেট্রেল বললেন, 'আমাকে দেখতে

চোখের আড়াল হলে

কি ড্রাগনের মত লাগে যে বাচ্চারা আমাকে দেখলেই ছুটে পালাতে চায়?'

'আচ্ছা,' বললাম আমি। 'ঘটনা তা হলে এ-ই।'

মিসেস লেনিং বলল, 'খুব ক্লান্ত বোধ করছিলেন মিস পেট্রেল। আমাকে বললেন শরীরটা ভাল লাগছে না। কিন্তু বুঝতে পারিনি এতটা অসুস্থ তিনি। তিনি বললেন, টীচাররা কেন যে ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে ছেলেমেয়েদের নামে তাঁর কাছে নালিশ করে? দুর্ভাগ্য আমাদের, একজন চমৎকার মহিলাকে আমরা হারালাম।' অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল তার চোখদুটো। 'জেনি কিছু বলেছে এ ব্যাপারে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'বলেছে মিস পেট্রেল নাকি রুমে ছিলেন না,' জবাব দিলাম আমি।

'পাজী মেয়ে,' মাথা নেড়ে বলল মিসেস লেনিং। 'তখন রুমেই ছিলেন হেডমিস্ট্রেস। খবরটা শোনার পর জেনি নিশ্চয় আঘাত পাবে। আজ বিকেলে একটি বিশেষ সভায় খবরটা প্রচার করবেন সিনিয়র মিস্ট্রেস।'

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে জেনি বলল তার হেডমিস্ট্রেসের মৃত্যুর কথা। 'তা হলে অসুস্থতার জন্যে কাল চারটে পর্যন্ত তিনি আর আমার জন্যে অপেক্ষা করেননি,' বলল সে। 'শরীর খারাপ লাগার জন্যে আগেই বাড়ি চলে গিয়েছিলেন।'

'জেনি মিথ্যে বোলো না, প্লীজ। কেন মিথ্যে বলছ?'

'কীসের মিথ্যে?' অবাক হলো জেনি।

'আমি জানি মিস পেট্রেল তোমার জন্যে রুমে অপেক্ষা করছিলেন।'

'তিনি রুমে ছিলেন না,' জোর দিয়ে বলল জেনি। 'আর তুমি কীভাবে জানো যে তিনি রুমেই অপেক্ষা করছিলেন?'

'সকালে মিসেস লেনিং এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। সে-ই বলল।'

'কী বলেছেন?'

'বলেছে, তুমি মিস পেট্রেলের রুমে ঢুকেই তাঁর দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে। অবশ্য তোমার পালানোতে হেডমিস্ট্রেস স্বস্তি পেয়েছিলেন। কাউকে শাস্তি দেয়া তিনি পছন্দ করেন না।'

'মা, কসম বলছি, আমি রুমে ঢুকে তাঁকে দেখতে পাইনি। রুমটা তখন খালি ছিল।'

'আর পারি না তোমাকে নিয়ে। খুব বাড়াবাড়ি করছ।'

'আমার কথা বিশ্বাস করো, মা,' জেনি বলল। 'মিসেস বার্নেসের বেলায়ও একই ঘটনা ঘটল। সেদিনও তুমি বিশ্বাস করোনি আমার কথা। অথচ আমি একটুও মিথ্যে বলিনি সেদিন।'

হঠাৎ করেই আতঙ্কের একটা ঢেউ বয়ে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। বুঝতে পারলাম অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটছে। যে দুজনকে আর সবাই দেখলেও জেনি দেখতে পায়নি তারা আর বেঁচে থাকেনি। মারা গেছে অল্পসময় পরে। আমার মনের কথাটা যেন বুঝতে পারল জেনি। বড় বড় চোখে তাকাল আমার দিকে। 'অবিশ্বাস্য ব্যাপার!' ফিসফিস করে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল সে।

সন্ধ্যায় হ্যারল্ডকে ঘটনাগুলো বললাম আমি। হেসে উড়িয়ে দিল সে আমার কথা। বলল, 'এটা নেহাতই কাকতালীয় ঘটনা। এরকম হতেই পারে। জেনির রূপকথার সাথে মিসেস বার্নেসের অ্যাকসিডেন্ট কিংবা মিস পেট্রেলের হার্ট অ্যাটাকের কোন সম্পর্ক নেই।'

ঘটনাগুলোকে আমার স্বামীর মতই হেসে উড়িয়ে দিতে

পারতাম জেনির রূপকথা বলে। কিন্তু মাত্র কয়েকদিন পরে আমার দুধওয়ালা, খুবই নিরীহ মানুষ ও'ব্রায়ানকে ঘিরে যে ঘটনা ঘটল তাতে আর উড়িয়ে দিতে পারলাম না রূপকথা বলে।

ও'ব্রায়ানের পাওনা আমি প্রতি শনিবারেই মিটিয়ে দিই। ওকে তখন এক কাপ কফিও খাওয়াই। সে সময়ে জেনি তার রুমেই থাকে। হোম ওয়ার্ক করে কিংবা করার ভান করে। সেদিন সকালে দিতে এল ব্রায়ান। কফি খেতে খেতে বলল, 'মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। সন্ধ্যায় দেখতে আসবে। মেহমানদের জন্যে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু দুধের পড়েছে আকাল।'

ব্রায়ান চলে যাবার পর রান্নাঘরে ঢুকল জেনি। বাটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'দুধ এল কোত্থেকে?'

'দুধওয়ালা দিয়ে গেছে,' বললাম আমি।

'কিন্তু সে এখানে এলে তো আমি জানালা দিয়ে তাকে দেখতে পেতাম।'

'তুমি বোধ হয় পড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলে।'

'আমার বয়েই গেছে,' বলল জেনি। 'ওই একই পড়া পড়তে ভাল লাগে না। আমি বাইরেই তাকিয়ে ছিলাম। মনে হয় সামনের পথ দিয়ে না এসে ব্যাটা বাড়ির ওপাশ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকেছে।'

কথা বাড়ালাম না আমি। জেনির সঙ্গে এত বকবক করতে আর ভাল লাগে না। পরদিন ছিল রবিবার। দুপুর গড়িয়ে গেল তবু দুধওয়ালার দেখা নেই। বিকেলের দিকে দুধ নিয়ে এল অপরিচিত এক ছেলে। 'এত দেরি কেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আর কেন,' বলল ছেলেটি। 'দুধের ভাণ্ডারে যা তা অবস্থা।

এদিকে কালরাতে বুড়ো ও'ব্রায়ান একটা মারামারি লাগিয়ে বসল। খাওয়া দাওয়া চলছিল সেখানে।'

'জানি,' বললাম আমি। 'মেয়ের বিয়ের কথা পাকা হচ্ছিল। ব্রায়ান বলেছিল আমাকে। কিন্তু কী হয়েছিল যে মারামারি করতে গেল?'

'মেয়ের চরিত্র নিয়ে কথা তুলেছিল একজন,' বলল ছেলেটি। 'মেয়েটার চরিত্র নাকি ভাল না। অনেক পুরুষের সাথে ঢলাঢলির অভ্যেস আছে। এই শুনে খেপে যায় ব্রায়ান। লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমনিতেই মাতাল ছিল ব্রায়ান, তার উপর বুড়ো। লোকটার সাথে পারবে কেন সে? লোকটার এক ঘুসিতে সে উড়ে গিয়ে পড়ল টেবিলের কোনায়। মাথাটা ঠুকে গেল। ডাক্তার এসে দেখল বেচারা মরে গেছে ততক্ষণে।'

'কী বললে? ব্রায়ান মারা গেছে?' ঘরটা হঠাৎ যেন দুলতে শুরু করল আমার চোখের সামনে। যেন দূর দূরান্ত থেকে ভেসে এল ছেলেটির কণ্ঠ, 'আমি দুঃখিত। আসলে এভাবে হুট করে কথাটা বলা ঠিক হয়নি আমার। স্থির হয়ে একটু বসুন। হ্যাঁ, এখন কি ভাল লাগছে?'

ধীরে ধীরে ধাতস্থ হলাম আমি। শরীরটা ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে উঠেছে। শীত করছে খুব। 'হ্যাঁ, এখন ভাল লাগছে।'

ঘরে ঢুকল জেনি। ছেলেটির দিকে তাকাল। 'মি. ও'ব্রায়ান আসেননি আজ?'

'তোমার মা পরে বলবেন সেকথা,' বলল ছেলেটি। 'একটু ধরো, মাথাটা ঘুরছে ওঁর।' ছেলেটি দ্রুত চলে গেল।

'তোমার কী হয়েছে মা?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল জেনি। 'মনে হচ্ছে তুমি অসুস্থ।'

'মারামারি করতে গিয়ে কালরাতে মারা গেছে মি. ও'ব্রায়ান,' বললাম আমি।

জেনির মুখ থেকে রক্ত সরে গেল। বলল, 'সেজন্যে কাল তাকে আমি দেখতে পাইনি।'

'ও কথা বোলো না,' বললাম আমি। 'কাল সকালে সে সুস্থ ছিল। ঘটনা ঘটেছে সন্ধ্যার পরে।'

'যখনই ঘটুক, সেকারণেই কাল সকালে তাকে আমি দেখতে পাইনি,' বলল জেনি। 'একই ঘটনা ঘটেছিল মিসেস বার্নেস ও মিস পেট্রেলের ক্ষেত্রে।' ভয়ে কেঁপে গেল তার কণ্ঠ। 'অবিশ্বাস্য! আমি বুঝতে পারছি না মা! এমন ঘটছে কেন?'

দেখলাম ভীষণ ভয় পেয়েছে জেনি। প্রকাশ পেতে দিলাম না তাই নিজের ভয়টা। হেসে বললাম, 'আসলে কিছুই ঘটেনি, মামণি। সবই তোমার কল্পনা।' কিন্তু ভয়টা লুকোতে পারলাম না আমি হ্যারল্ডের কাছে। বললাম তাকে দুধওয়ালার ঘটনাটা। এবারও হেসে উড়িয়ে দিল সে। বলল, 'বাদ দাও এসব। জেনি আসলে চাইছে সবার নজর কাড়তে। মনে করছে সে যা বলছে সেটাই সত্য হচ্ছে। এসব ফালতু কথা যেন আমার সামনে এসে না বলে। তা হলে পিটিয়ে সোজা করে ফেলব।'

অনেকদিন হাঁটাচলা করতে পারছে না আমার শাশুড়ি। খুব অসুস্থ সে। সেদিন সন্ধ্যায় তাকে দেখতে যাবার কথা। হঠাৎ জেনি ফিসফিস করে বলল, 'মনে করো তাকে গিয়ে আমি দেখতে পেলাম না, তা হলে কী হবে তুমি তো জানো।' হ্যারল্ডের কথা সেই মুহূর্তে মনে পড়ল আমার। মনে হয় ঠিকই বলেছে হ্যারল্ড। জেনির মধ্যে এক ধরনের নাটক করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। সে চায় সবকিছুর মধ্যমণি হতে। আচ্ছা আমার শাশুড়িকে দেখতে গিয়ে যদি সে সত্যিসত্যিই বলে সেখানে কেউ নেই– তা হলে?

সেরকম কিছু ঘটল না। বাড়ি ফেরার সময় জেনি বলল, 'ওনাকে নিয়ে ভেব না, বাবা। মরতে অনেক দেরি আছে।'

'তোমার মতামত শুনতে চাচ্ছি না আমরা,' তীব্র স্বরে বলল হ্যারল্ড। 'মা এখনি মরছেন কে বলেছে তোমাকে?'

হাসল জেনি। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। সেই দৃষ্টি দেখে আবারও ভয় পেলাম আমি।

জেনির ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করতে গেলাম ডাক্তারের সাথে। আমাদের পারিবারিক বন্ধু সে। তিনটে ঘটনাই খুলে বললাম ওকে। সব কিছু শুনে হাসল ডাক্তার। বলল, 'বুদ্ধিমতি মেয়ে তোমার জেনি। কিন্তু বয়সটা হলো খারাপ। কৈশোর ও যৌবনের মাঝামাঝি। এ বয়সে মেয়েরা অনেক পাগলামিই করে। মনের মধ্যে থাকে ফুরফুরে ভাব। বাতাসে ভাসতে থাকে। নিজেকে মনে করে অন্য জগতের কেউ। দোষ তার না, দোষ বয়সের। শরীর ঠিক আছে তো?'

'দেখলে তো মনে হয় সুস্থই।'

'এ বয়সে এরকম হওয়াটা স্বাভাবিক,' বলল ডাক্তার। 'তার কিচ্ছু হয়নি। তবে অনেক সময় কারও কারও মধ্যে অতীন্দ্রিয় চেতনা দেখা দেয়। ভবিষ্যৎ মৃত্যুকে সে দেখতে পায়। এ নিয়ে হৈ চৈ করার কিছু নেই। স্বাভাবিকভাবে মেনে নাও। তবে তার সাথে এসব নিয়ে বেশি আলোচনা কোরো না। তা হলে তার আগ্রহ বেড়ে যাবে আরও। এ নিয়ে বেশি চিন্তা কোরো না। কী ব্যাপার, এত ফ্যাকাসে লাগছে কেন তোমাকে? রাতে বুঝি ঘুম হয় না?'

'একদম ঘুমোতে পারি না ডাক্তার,' বললাম আমি। 'ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে চেপে বসে আছে।'

প্রেসক্রিপশন লিখল ডাক্তার। ঘুমের ওষুধ দিয়েছে আমাকে।

বাড়ি ফিরে এলাম ওটা নিয়ে।

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ঘটল না কিছুই। সামনে জেনির পরীক্ষা। তাই নিয়ে ব্যস্ত ও। সেই সাথে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। পড়াশোনা বিশেষ করেনি সে। প্রস্তুতি ভাল না। তার ভয়, প্রশ্নপত্র হাতে পাবার পর সে হয়তো কিছুই লিখতে পারবে না।

দেখতে দেখতে চলে এল পরীক্ষার দিন। ওর জন্যে নাস্তা বানালাম আমি। কিন্তু নাস্তা খেতে নীচে নামল না সে। কয়েকবার ডেকেও সাড়া পেলাম না তার। শেষ পর্যন্ত আমি গেলাম তার রুমের দিকে। দেখি বিছানায় বসে আছে সে। ভয়ানক আতঙ্কে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে।

'এসো, দেরি হয়ে যাচ্ছে তো,' ডাকলাম ওকে।

'স্কুলে যাব না আজ। ভাল লাগছে না।' জবাব দিল সে। 'আমি এখানেই থাকব।'

'তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ?'

'হ্যাঁ, মা। খুব অসুস্থ আমি। ভয়ানক অসুস্থ। স্কুলে যেতে পারব না।'

'তা হলে ডাক্তারকে খবর দিই।'

'না। তিনি এসে বলবেন যে আমার কিচ্ছু হয়নি।'

'কিছু হলে তবে তো বলবে? জেনি তোমাকে স্কুলে অবশ্যই যেতে হবে। পরীক্ষা তুমি আগেও দিয়েছ। একটা পরীক্ষা খারাপ হলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।'

'আমি পরীক্ষা নিয়ে ভাবছি না,' বলল জেনি। 'ও নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। আমি, আমি মরতে চাই না, মা।'

'কী আজেবাজে কথা বলছ? মরতে যাবে কেন তুমি?'

'আমি বাড়িতেই নিরাপদে থাকতে চাই, মা। বাইরে বেরোলে

আমার খুব বিপদ হবে।'

'কীসের বিপদ?'

'যে কোন ধরনের বিপদ হতে পারে। গাড়ি আমাকে চাপা দিতে পারে, আগুন লাগতে পারে, কেউ হামলা করতে পারে, যে কোন্ বিপদ একটা ঘটবেই।'

'রাতে কি কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছ তুমি?'

'হ্যাঁ, দেখেছি। সে তো প্রায়ই দেখি। কিন্তু স্বপ্নের কথা নয়। মা, আমাকে তুমি বাইরে যেতে বোলো না।' হঠাৎ করে কাঁদতে শুরু করল জেনি।

হাত বুলিয়ে দিলাম তার পিঠে। গাঢ় স্বরে বললাম, 'তোমার ভয়টা কী নিয়ে তা আমাকে বললে তোমাকে বাড়িতে থাকতে দেব। নিশ্চয় পরীক্ষার ব্যাপারে ভয় পাচ্ছ?'

'ওটা তো সামান্য ব্যাপার,' বলল জেনি। 'যদি সত্যি কথা বলি তুমি তা হলে বিশ্বাস করবে না।'

'বলোই না।'

'বলছি। আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে আয়নায় মুখ দেখলাম।'

তার ভেজা, ফ্যাকাসে, ভয় পাওয়া ছোট্ট মুখটার দিকে তাকালাম আমি। আস্তে করে বললাম, 'সকালে সবার মুখ অপূর্ব সৌন্দর্যে ভরে ওঠে। তাই কী?'

আমার রসিকতা গায়ে মাখল না সে। বলল, 'ড্রেসিং টেবিল থেকে আয়নাটা নিয়ে এসো।'

আয়নাটা এনে তার হাতে দিলাম।

'আমার পেছনে এসে দাঁড়াও,' বলল সে।

আমি তার কথা শুনলাম। দাঁড়ালাম তার পেছনে। আয়নাটা সামনে মেলে ধরল ও। আমি আমার ও ওর মুখটা আয়নায়

দেখতে পেলাম। ঠাট্টা করে বললাম, 'আহ্ কী সুন্দর দেখাচ্ছে আমাদের।'

'আমাদের?' শুষ্ক কণ্ঠে বলল ও। 'কী দেখতে পাচ্ছ তুমি?'

'তোমাকে ও আমাকে।' বললাম আমি। 'আমাদের দুজনকে।'

আয়নাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল জেনি। বলল, 'আমি দুজনকে দেখছি না। আমি দেখছি শুধু তোমাকে। নিজেকে দেখতে পাচ্ছি না। এর কি অর্থ তুমি জানো?'

বাচ্চাদের সিজোফ্রেনিয়া রোগের কথা হঠাৎ করে মনে পড়ল আমার। বইতে পড়ছি। শুনেছি রেডিওতে। এখন দেখছি তা নিজের ঘরের মধ্যেই। ওর কণ্ঠ শুনেই বুঝছি মিথ্যে কথা বলছে না ও।

'পরীক্ষার সময় অসুখ বাধিয়ে ভালই করেছ তুমি,' বললাম আমি। 'আর সবাই যখন পরীক্ষার জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়বে তখন চাদর মুড়ি দিয়ে আরামে শুয়ে থাকবে তুমি। নাও, শুয়ে পড়ো, দুশ্চিন্তা কোরো না।'

'ধন্যবাদ, মা!' ফুঁপিয়ে উঠল জেনি। শুয়ে পড়ল। গাল বেয়ে নেমে পড়ল অশ্রুধারা।

নীচে নেমে হ্যারল্ডকে বললাম আমি। কফিতে চুমুক দিতে যাচ্ছিল ও। থেমে গেল। বলল, 'আয়নায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছে না, তাই তো? ভালই ধোঁকা দিয়েছে তোমাকে।'

'সত্যি কথাই বলছে ও,' বললাম আমি। 'একেবারে ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে মেয়েটা। আয়নায় তাকিয়ে নিজের মুখটা দেখতে পাচ্ছে না। আমার কাছে সুবিধার মনে হচ্ছে না।'

'কল্পনার রাজ্যে আছে ও,' বলল হ্যারল্ড। 'সব কিছুই ওর কল্পনা। পরীক্ষা না হয়ে যদি স্কুলে উৎসব হত দেখতে সে এমন

করত না। আমি বাজি রেখে বলতে পারি।'

'আমি জেনিকে বিশ্বাস করি। ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি আমি।'

'আমাকে আবার এর মধ্যে জড়িও না।' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হ্যারল্ড। ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। ওকে যতটুকু ভালবাসি ততটুকুই ঘৃণা করি।

ডাক্তার এল। কাঁদতে কাঁদতে সব কথা ওকে খুলে বলল জেনি। ডাক্তার 'হ্যাঁ', 'হুঁ' করে গেল। তারপর মুখ ফেরাল আমার দিকে। 'বিছানায় শুইয়ে রেখো ওকে। এতে কিছুটা ভাল লাগবে।' উঠে দাঁড়াল ডাক্তার। আমাকে বাইরে এনে একটা প্রেসক্রিপশন লিখল। বলল, 'হালকা ঘুমের বড়ি এটা। পরীক্ষার সময় অনেক ছেলে মেয়েকে খাইয়ে ভাল ফলাফল পেয়েছি। ওষুধের দোকান থেকে নিয়ে এসো। দুপুরে একটা, বিকেলে একটা, শোয়ার সময় একটা, আবার কাল সকালে একটা দিও। দেখবে স্থির মনে পরীক্ষা দিতে পারছে ও।'

'তোমার ধারণা স্নায়ুর উপর অতিরিক্ত চাপের জন্যে এটা হচ্ছে?'

'আমার ধারণা তাই। বেশি পরিশ্রম করে "হিস্টিরিয়া"তে আক্রান্ত হয়েছে। সন্ধ্যার দিকেই অনেকটা ভাল হয়ে যাবে। ওষুধগুলো যাতে ঠিকমত খায় সেদিকে লক্ষ রেখো। ভয়ের কিছু নেই। আশা করছি তাড়াতাড়িই ভাল হয়ে যাবে। অবস্থার উন্নতি না হলে আমাকে রিং কোরো।'

ডাক্তার চলে যাবার পর উপরে উঠলাম আমি। জেনিকে বললাম, 'ওষুধ আনতে যাচ্ছি দোকানে। আধঘণ্টা লাগবে। একা একা থাকতে পারবে তো?'

'পারব,' বলল জেনি। 'বিছানায় তো কোন ভয় নেই, তাই না?'

দুহাত বাড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল জেনি। ওর হাত দুটোকে খুব সরু মনে হলো। এখনও স্পষ্ট মনে আছে আমার, তার সেই উৎকণ্ঠায় ভরা গাঢ় আলিঙ্গন অন্য সব বারের চাইতে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। ওষুধ আনতে বেরিয়ে গেলাম আমি। মেয়েটা যাতে বেশিক্ষণ একা একা না থাকে সেজন্যে প্রায় ছুটতে ছুটতে দোকানের দিকে গেলাম।

ফেরার সময় চিন্তায় এতটা মগ্ন ছিলাম যে লক্ষ করিনি মাথার উপর দিয়ে বিমান উড়ে যাচ্ছে। একটু পরেই তার প্রচণ্ড শব্দ কানে এল। তাকিয়ে দেখলাম খুব নিচু দিয়ে যাচ্ছে বিমানটা। ইঞ্জিনটা একবার বন্ধ হচ্ছে, একবার চলছে। গর্জনটাও সেই সাথে একবার কমছে, একবার বাড়ছে।

হঠাৎ ইঞ্জিনটা থেমে গেল। আর কোন শব্দ নেই? কী ভয়ঙ্কর নিঃস্তব্ধতা। দেখলাম প্লেনটা সোজা নেমে এল। আমি যে রাস্তা ধরে এতক্ষণ হাঁটছিলাম তার ওপাশের বাড়িগুলোর পেছনে প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে পড়ল। চমকে উঠলাম আমি। ওদিকেই তো আমাদের বাড়ি। আর ঠিক তখনই শুনতে পেলাম গগনবিদারী একটা আর্তনাদ।

ছুটতে লাগলাম আমি। এত দ্রুত এর আগে জীবনে ছুটিনি কখনও। যখন বাড়িতে পৌঁছলাম দেখলাম সেটা তখন একটা ধ্বংসস্তূপ মাত্র।

আগুন জ্বলছে পুরো বাড়িতে। লক লক করে বেড়ে উঠছে আগুনের শিখা। ভাঙা প্লেনটা ইঁট, পাথর ও কাঁচের সঙ্গে একত্রিত হয়ে পড়ে আছে মুখ থুবড়ে। এবং পড়ে আছে বিমান চালকের রক্ত-মাংস-হাড়। পুড়ছে চড় চড় করে। আর পড়ে আছে একটি নিঃসঙ্গ মেয়ে। আমার মেয়ে জেনি। মৃত।

এটাই হলো অনেক দিন আগের সেই ঘটনা। আমাকে

দুঃস্বপ্নের মত তাড়া করে ফেরে। আমি খুঁজে পাইনি এ রহস্যের কোন সমাধান। দুঃসহ সেই স্মৃতি এখনও ডুকরে কাঁদে আমার বুকে। এখন বুঝতে পারছেন তো বিমানের শব্দ শুনলে কেন আমি এত ভয় পাই আর কেন শুনতে পাই অপার্থিব আর্তনাদ, যে আর্তনাদের শব্দ কেবল আমি একাই শুনি– আর কেউ শুনতে পায় না।

মূল: রোজমেরি টিমপারলি

রূপান্তর: মিজানুর রহমান কল্লোল

কামাখ্যা সাহেব

চায়ের কাপে চামচ নাড়ার টুং টাং শব্দ।

'সাঈদ ভাই, তুহীনের ব্যাপারে আপনি কিছু একটা করুন।'

'কেন, রেজার কী হয়েছে?'

'জানেনই তো, আপনার বন্ধু সারাদিন শুধু কাজ নিয়ে ব্যস্ত। খালি লেখা আর লেখা।'

'ও নামী মানুষ। গুণী লেখক।'

'ওকে আমি এসব ব্যাপারে বিরক্ত করতে চাই না। কামাখ্যা সাহেব না কি ও এসবের মাথা-মুণ্ডু কিছু বুঝতেও পারবে না। তা ছাড়া এসব কাজে পুরুষ মানুষের দরকার।'

ঘরের ভেতর আরামদায়ক, নিশ্চিন্ত পরিবেশ। লম্বা পা দু'খানা ছড়িয়ে দিয়ে আয়েশ করে বসল সাঈদ। রুমা যখন ঘ্যান ঘ্যান করে তখনও ওর মধ্যে আশ্চর্য এক স্নিগ্ধতা খুঁজে পায় ও। শেষ বিকেলের আলোয় ওর ঢেউ খেলানো চুলগুলো অপূর্ব লাগছে। নীলচে সুতি শাড়ি আর লাল ব্লাউজে চমৎকার মানিয়েছে ওকে।

ছোট্ট এক ঘূর্ণিঝড় প্রচণ্ড বেগে ঘরে প্রবেশ করে থমকে গেল, রুমা যখন বলল, 'তু-হী-ন! সাঈদ চাচাকে স্লামালেকুম বলেছ?'

সালাম দিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পাঁচ বছরের তুহীন।

'সাঈদ ভাই...' রুমা যুগিয়ে দিল।

সিধে হয়ে বসল সাঈদ, মুখে পরে নেয়ার চেষ্টা করল গাম্ভীর্যের মুখোস।

'হ্যাঁ, তুহীন,' বলল সে, 'কোথায় চললে অমন ঝড়ের বেগে?'

'কামাখ্যা সাহেবের কাছে। সে সন্ধের দিকেই বেশি আসে।'

'তোমার মার কাছে কামাখ্যা সাহেবের কথা শুনলাম। খুব মজার মানুষ বুঝি?'

'হ্যাঁ, দারুণ, সাঈদ চাচা। ওর না ইয়া লম্বা একটা লাল নাক, হাতে লাল দস্তানা, লাল লাল চোখ– কাঁদলে যেমন হয় তেমন না, সত্যিকারের লাল– লাল লাল দুটো ডানাও আছে, ঝাপটাতে পারে। ইস, উড়তে পারলে আরও মজা হত। আর কী সুন্দর করে যে কথা বলে যদি শুনতেন। উফ্!' তুহীনের অভিব্যক্তিতে বোঝা গেল কামাখ্যা সাহেব অসাধারণ একটা কিছু।

'কামাখ্যা নামটা খুব মজার, তাই না, তুহীন?'

'হ্যাঁ, আর মানুষটা আরও মজার। মানুষ নাকি ইটির মত কে জানে।'

'সাঈদ ভাই!' চোখ রাঙাল রুমা। 'আপনি দেখছি ওকে আরও লাই দিচ্ছেন। ও তো ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছে। তুমি তো ঠাট্টা করছ আমাদের সাথে, তাই না, তুহীন?'

'না, আম্মু। কামাখ্যা সাহেব সত্যি সত্যি আছে।'

'রুমা, তুমি– শোনো, তুহীন বাবু। আমি তোমার কথা ঠিকই বিশ্বাস করি, তোমার আম্মু করুক আর না করুক। এক কাজ করো না, আমাদেরকেও ওই বাগানটাতে নিয়ে চলো, আমরাও তোমার কামাখ্যা সাহেবকে দেখি। তখন দেখা যাবে তোমার আম্মু কী বলে।'

'উঁহুঁ, মাথা নেড়ে বলল তুহীন। 'কামাখ্যা সাহেব মানুষ-জন

পছন্দ করে না। শুধু বাচ্চা ছেলেদের ভালবাসে। আমাকে বলে দিয়েছে আমি যদি কাউকে তার কাছে নিয়ে যাই তা হলে গুংগাকে বলে দেবে। গুংগা খুব খারাপ। ও আমাকে মেরে ফেলবে। আমি এখন যাই।' ঘূর্ণিঝড়টা পরমুহূর্তে উধাও হয়ে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রুমা। 'আপনার সামনে তাও তো অনেক কথা বলল। আমাকে তো নামটা ছাড়া আর কিছুই বলতে চায় না। তবে এটা বলেছে, কামাখ্যা সাহেব নাকি গুংগার নাম করে ভয় দেখায়। আমিও কায়দা পেয়ে গেছি। খাবে না কিংবা দাঁত ব্রাশ করবে না শুধু গুংগার নাম উচ্চারণ করলেই হলো!'

উঠে পড়ল সাঈদ। 'চিন্তার কিছু আছে বলে তো মনে হলো না। ওর কামাখ্যা সাহেব ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশি করবে। বাচ্চারা কল্পনাশক্তি কাজে লাগালে ভালই তো, বুদ্ধি খোলতাই হবে।'

'আমার তো কামাখ্যা সাহেব, কামাখ্যা সাহেব শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। আপনাকে শোনালে বুঝতেন–'

হেসে উঠল সাঈদ। 'আজ চলি। সিরিয়াসলি, রেজাকে ওর সাথে কথা বলতে বলো না।'

অসহায়ের মত দু'হাত ছড়িয়ে দিল রুমা।

'বুঝতে পেরেছি। আমাকেই সামলাতে হবে।'

সেদিন বিকেলে খোশমেজাজে পাওয়া গেল কামাখ্যা সাহেবকে। সারাক্ষণ ঝটপট করতে লাগল তার ডানা দুটো। এর অর্থ, ভিনগ্রহ থেকে বন্ধু আসবে দেখা করতে, জানাল কামাখ্যা সাহেব।

আজব আজব সব বন্ধু-বান্ধব রয়েছে কামাখ্যা সাহেবের। বিচিত্র সব কাণ্ড-কারখানা ঘটায় তারা। এজন্যেই সাদামাঠা মানুষ-জন পছন্দ করে না সে। অদ্ভুত কীর্তিকলাপ দেখে দেখে অভ্যস্ত

হয়ে গেছে কিনা।

কামাখ্যা সাহেবের এক বন্ধু টাইম মেশিনে করে পাঁচশো-একহাজার বছর অতীতে কিংবা ভবিষ্যতে চলে যেতে পারে। প্রায়ই তার সাথে ঘুরতে যায় কামাখ্যা সাহেব, আর ফিরে এসে গল্প বলে পাঁচশো বছর আগে ঠিক এই মুহূর্তে কী ঘটেছিল। আরেক বন্ধু তো আরও অদ্ভুত। মহাশূন্যের প্রত্যেকটা গ্রহের সাথে রেডিও যোগাযোগ আছে তার– যখন খুশি ভিনগ্রহের বন্ধুদের সঙ্গে গল্প-গুজব করে। কিন্তু হ্যাঁ, ওরা যেমন আছে তেমনি গুংগাও আছে। কারও বন্ধু নয় সে, এমনকী কামাখ্যা সাহেবেরও না।

সন্ধে লেগে এসেছে, কিন্তু আম্মু এখনও লোক পাঠায়নি। কাজেই আরও কিছুক্ষণ কামাখ্যা সাহেবের সাথে থাকতে পারবে তুহীন। মনটা খুশি হয়ে উঠল ওর।

কামাখ্যা সাহেব তার রক্তচক্ষু দুটো স্থাপন করল তুহীনের চোখে। 'তুহীন, চলো আজ তোমাদের বাসায় যাই।'

'কিন্তু বাসায় তো লোকজন থাকে। আপনি তো লোকজন–'

বারো দিন হলো কামাখ্যা সাহেবের সাথে মিশছে তুহীন। কখনও তো সে বাসায় যেতে চায়নি। আজ কেন চাইছে মাথায় এল না তুহীনের।

'হ্যাঁ, পছন্দ করি না। তাই তো তোমাদের বাসায় যেতে চাইছি। কই এসো, না হলে কিন্তু–'

কী আর করা, গুংগার নামটা শুনতেও যেহেতু রাজি নয় তুহীন?

থাই অ্যালুমিনিয়ামের জানালা গলে বাবার লেখার ঘরে ঢুকে পড়ল তুহীন। সবাইকে নিষেধ করা আছে না ডাকলে কেউ ওঘরে যাবে না। কিন্তু কামাখ্যা সাহেবের বেলায় তো আর এসব নিয়ম-

কানুন খাটে না। আর বিশেষ করে সে তো এ ঘরেই আসতে চেয়েছে।

বাবা গভীর মনোযোগে লেখার কাজে ব্যস্ত। কামাখ্যা সাহেব সন্তর্পণে একটা টেবিলের কাছে গিয়ে নিঃশব্দে ড্রয়ারটা খুলে ফেলল। ভেতর থেকে বের করে নিল কী একটা যেন।

বাবা কী জন্যে হঠাৎ মুখ তুলতেই দেখতে পেল তুহীনকে। খেপে উঠতে যাচ্ছিল সে: 'কী ব্যাপার? তুমি এখানে যে? তোমাকে না বলেছি যখন তখন এঘরে আসবে না–'

পরিচয় পর্বটুকু বিনয়ের সাথে সারতে হয়। 'বাবা, এই যে কামাখ্যা সাহেব। দেখো না কেমন লাল লাল পাখা ওনার–'

ড্রয়ার থেকে বের করা পিস্তলটায় ততক্ষণে সাইলেন্সার জোড়া হয়ে গেছে। বাবার কপালে সই করে একটামাত্র গুলি করল কামাখ্যা সাহেব। সামনের দিকে স্বচ্ছ খুদে এক ফুটো তার পেছনে মস্ত বড় এক গর্ত তৈরি করল বুলেটটা। মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল বাবা।

'শোনো, তুহীন,' বলল কামাখ্যা সাহেব, 'এখানে অনেক লোক আসবে। তোমাকে নানা রকম প্রশ্ন করবে। তুমি এঘরে যা দেখেছ তাই বলবে কেমন, নইলে আমি কিন্তু গুংগাকে পাঠাব তোমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।'

কামাখ্যা সাহেব এবার জানালা গলে পা রাখল মেটে পথে।

'অদ্ভুত ব্যাপার, ইন্সপেক্টর,' ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন। 'সাইকিয়াট্রির ওপর আমার কিছু পড়াশোনা আছে। এক্সপার্টরা মতামত দেয়ার আগে আমি আপনাদেরকে একটা সূত্র দিতে পারব আশা করি। বাচ্চাটা বলছে কামাখ্যা সাহেব নামে ওর ভিনগ্রহের বন্ধুটা রেজা সাহেবকে গুলি করেছে। এর দু'রকম অর্থ

করা যায়। প্রথমটা হলো, ভদ্রলোক আত্মহত্যা করেছেন, কিন্তু বাচ্চাটা চোখের সামনে এরকম বীভৎস দৃশ্য দেখে ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি, মনগড়া একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে। আর আরেকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, ছেলে নিজেই বাপকে খুন করেছে। তারপর বলির পাঁঠা হিসেবে কামাখ্যা সাহেব নামে এক অলৌকিক ভিনগ্রহবাসীর অবতারণা করেছে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটার আরও মারাত্মক অর্থও করা যেতে পারে। ছেলেটা হয়তো বাপকে পছন্দ করত না, বাপের বিকল্প তৈরি করেছিল মনে মনে, এবং শেষে সেই বিকল্পকে ব্যবহার করে বাবাকে সরিয়ে দেয় দুনিয়া থেকে। আমার বুদ্ধিতে যা কুলোল তাই বললাম। এখন আপনারা দেখুন, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, পিস্তল এগুলো পরীক্ষা করে এক্সপার্টরা কী রায় দেয়। কে খুন করল, কী তার মোটিভ আপনারাই ভাল বুঝবেন...'

লাল নাক, চোখ, দস্তানা আর ডানার অধিকারী লোকটা পেছনের পথ দিয়ে আলগোছে নিজের বাড়িতে চলে এল। ভেতরে ঢোকা মাত্র কোটটা খুলে ফেলল সে। কলকব্জা আর রবার দিয়ে তৈরি ডানা দুটো খসিয়ে ফেলল। জিনিসগুলোকে সোজা গ্যাসের চুলোয় চড়াল ও। আগুন ভাল মত ধরলে, দস্তানা জোড়া তাতে ফেলে দিল। এবার নাকটার ব্যবস্থা করল ও, ভাল মত ঘষতে বাইরের লালচে পুটিংটুকু মিলিয়ে গিয়ে স্বাভাবিক বাদামী রংটা বেরিয়ে এল। দেয়ালের ফাটলটায় ওটা সাঁটিয়ে ঘষে মসৃণ করে দিল ও। এবার বাদামী চোখজোড়া থেকে লাল টুকটুকে কন্ট্যাক্ট লেন্স দুটো খুলে কিচেনে চলে এল। একটা হাতুড়ি দিয়ে পেটাতে স্রেফ পাউডার হয়ে গেল ওদুটো, তারপর ধুয়ে চলে গেল সিঙ্ক বেয়ে।

একটা ড্রিঙ্ক ঢালল সাঈদ, এবং অবাক হয়ে আবিষ্কার করল ড্রিঙ্কের কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু ক্লান্তি বোধ করছে সে।

বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ঘটনার আদ্যোপান্ত ভেবে দেখতে পারে ও। সেই কামাখ্যা সাহেবের উদ্ভাবন থেকে আরম্ভ করে আজকের সাফল্য বিচার করে দেখবে ও। তারপর অদূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখবে তারিয়ে তারিয়েঃ সুন্দরী-গুণবতী রুমা যখন গোলাম রেজা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে ওর ঘর আলো করতে আসবে। বিধবা মেয়েটিকে উদ্ধার করলে লোকে যেমন বাহ্বা দেবে, তেমনি বাপ মরা বাচ্চাটা একজন সত্যিকারের পুরুষমানুষকে বাবা হিসেবে পাবে।

বেডরুমে গিয়ে ঢুকল সাঈদ। তারপর ভূত দেখার মত চমকে উঠল। বিছানায় কে ওটা?

নিথর দাঁড়িয়ে রইল ও।

'কামাখ্যা সাহেব না?' বদ্ধ ঘরে গমগম করে উঠল গুংগার কণ্ঠস্বর।

(বিদেশী গল্প অবলম্বনে)

কাজী শাহনূর হোসেন

সমাধি

সবুজ ঘাসে ছেয়ে যাওয়া গাড়ি বারান্দায় কনভার্টিবলের ব্রেক কষল জন বিশ্বাস, হাত বাড়িয়ে ইগ্‌নিশন সুইচ অফ করে দিল।

'এসে গেছি,' বলল সে। 'আমার ছেলেবেলার বাড়ি। চোদ্দ বছর বয়সে ঘর ছেড়েছিলাম– আর আজ আসা। তাও একেবারে বউসহ।'

'এই বাড়ি!' পলি বিশ্বাসের আয়ত চোখজোড়ায় বিস্ময় ফুটে উঠল। সন্ধ্যার ম্লান আলোয় কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল সে জীর্ণ খিলান, ভাঙা জানালা আর জায়গায় জায়গায় পলেস্তরা খসে পড়া প্রাচীন অবয়বটার দিকে। এই দোতলা কাঠামোটা আদৌ কোনওকালে সুদৃশ্য আর বসবাসের যোগ্য ছিল কিনা তা নিয়ে সন্দেহ জাগছে তার মনে।

অজস্র লতা-গুল্মে আচ্ছাদিত প্রাচীন ভবনটা শ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধের মত মুখ ব্যাদান করে তাকিয়ে আছে। আশেপাশে অসংখ্য ছোট-বড় ডোবা; নোংরা পানিতে নাম না জানা জলজ উদ্ভিদ। আবর্জনাপূর্ণ ডাস্টবিন যেন একেকটা। তরুণীর গা গুলিয়ে উঠল। 'জন, তুমি ঠাট্টা করছ না তো?'

'টাকা পয়সার ব্যাপারে কখনও ঠাট্টা করি না আমি,' জন

বিশ্বাস হালকা সুরে বলল। 'ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হয়ে এই সুদূর নুলিয়াছড়ির সাগর তীরের বাড়িতে খামোকা তোমাকে টেনে আনিনি, পলি। তুমি তো জানোই, আমার সমস্ত সম্পত্তি পেন্ডিং হয়ে পড়ে আছে। ওগুলোর দাবি আমি ছাড়তে পারি না।'

জন কথা শেষ করে গাড়ির দরজা খুলল। পেছনের সীট থেকে দুটো ব্যাগ উঠিয়ে নামল গাড়ি থেকে। দেখাদেখি পলিও।

'বাড়ির যে ছিরি, এর ভেতর কী এমন লক্ষ টাকার সম্পত্তি রয়েছে তোমার?' পলির কণ্ঠে অবিশ্বাসের স্পষ্ট ছোঁয়া।

জন বউকে আশ্বস্ত করল, 'আছে-আছে। নইলে বড়দা টম বিশ্বাসের মরার খবর পেয়ে ছুটে আসি আমি? উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া লক্ষ লক্ষ টাকা আগলে রেখেছিল সে। বড়দা নেই, বেঁচে আছে ওই এমিলি বুড়িটা। আর আছি আমি। ভাই-এর সম্পত্তি ভাই-ই তো দাবি করবে, তাই না? এখন চলো, বুড়ির সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।'

ব্যাগ দুটো বারান্দায় তুলে রাখল জন। ততক্ষণে দিনের আলো পুরোপুরি নিভে গেছে। ভুরু কুঁচকে আকাশের দিকে তাকাল জন। ঘন মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে সেখানে। খানিকটা যেন বেড়েও গেছে বাতাসের বেগ। অদূরে ঝাউগাছগুলো সশব্দে আন্দোলিত হচ্ছে। ঝড় উঠবে না তো আবার? জন কান পাতল। আরও যেন ভারী শোনাচ্ছে সমুদ্রের গর্জন।

প্রায় অন্ধকারে ডুবে আছে বাড়িটা। কেবল একটা জানালার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে। পায়ে পায়ে সেদিকে এগোল ওরা। নিঃশব্দে উঁকি দিল ভেতরে।

ঘরের ভেতরে ম্লান আলো। এককোণে একটা কাঠের

পিয়ানোর ওপর রাখা কেরোসিনের ল্যাম্প থেকে মৃদু আলো ছড়িয়ে পড়েছে। কালো গাউন পরা এক বৃদ্ধা বসে আছে পিয়ানোর সামনে। পাশেই রকিং চেয়ারে বসে মৃদু দোল খাচ্ছে আরেক বৃদ্ধা। তাঁর কোলে একটা খোলা বই।

কালো পোশাক পরিহিতা মৃদু সুর তুলছিল পিয়ানোতে। দুজনেরই ঠোঁট নড়ছে। প্রার্থনা সংগীত গাইছে ওঁরা। জন আর পলি কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল।

'আমাদের সঙ্গ দাও, হে প্রভু–' তীক্ষ্ণ সুরে একজোড়া প্রাচীন কণ্ঠ বাজনার সাথে ক্রমশ এক হয়ে উঠল। 'সাঁঝের আগমনের সাথে, যখন গাঢ়তর হয়ে ওঠে রাতের আঁধার, হে প্রভু, আমাদের সঙ্গ দাও...'

জন বিশ্বাস ফিসফিস করে বলল, 'ওই যে বুড়িটা পিয়ানো বাজাচ্ছে, ওই-ই এমিলি চাচী। আর রকিং চেয়ার দুলছে, ও হলোগে মেরী চাচী। বহু বছর ধরে এ বাড়িতে ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। সত্তুরের ওপর বয়স দুজনেরই। আমাকে দেখে যা একটা শক্ পাবে না... ওরা জানে আমি অনেক আগেই মরে গেছি।'

সদর দরজাটা পাশেই, জন পা দিয়ে ঠেলা দিল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে খুলে গেল পাল্লা।

ভেতরটা ঠাণ্ডা আর গুমোট। আসবাবপত্র সব প্রাচীন আমলের। দুজনে ঘরে ঢুকতেই এমিলি চাচী ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। মুখ তুলল মেরী চাচী। অসংখ্য বলি রেখায় কুঁচকে যাওয়া একজোড়া মুখমণ্ডলে ফুটে উঠল প্রশ্নবোধক ছাপ।

ততক্ষণে থেমে গেছে পিয়ানো। এমিলি চাচী শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমরা? এই প্রাচীন জলদস্যুদের বাড়িতে কী চাও?'

'আমি জন, এমিলি চাচী,' জন ঘোষণা করল। 'জন বিশ্বাস। তোমাকে দেখতে এসেছি।'

বৃদ্ধার মুখের ভাব এতটুকু বদলাল না। 'জন মারা গেছে। পাঁচ বছর আগে ঢাকায় রোড অ্যাকসিডেন্টে মৃত্যু হয়েছে তার। খবরের কাগজে দেখেছি, টম পড়ে শুনিয়েছিল আমাকে।'

'আমার নামের কেউ একজন মারা গিয়েছিল, এমিলি চাচী। আমি নই। ভাল করে দেখো, আমি বেঁচে আছি। আর এ হলো পলি। আমার স্ত্রী।'

'আহ্!' এমিলি চাচীর দৃষ্টি ঘুরে গেল পলির দিকে। 'সুন্দর একটা পাখি দেখছি!'

'শুনুন, আমি–' পলি কথা শেষ করতে পারল না, জনের নীরব ইশারায় থেমে গেল।

'কী সুন্দর মেয়ে, যদিও যতটা সুন্দরী হবার কথা ততটা নয়,' এমিলি চাচী বলল। 'ডাই করা লাল চুল, বাদামী চোখ। ডাইনী না তো? দুঃখজনক, সত্যিই দুঃখজনক! মেয়েটাও তো মারা গেছে।'

'কী সব যা তা বকছেন, আমি মারা গেছি মানে?' পলি রাগে ফেটে পড়ল। 'জন! এ যে দেখছি পাগলের আখড়া! আগে জানলে কক্ষনো এখানে আসতাম না।'

'শান্ত হও,' বলল জন, যদিও এমিলি চাচীর ভাব দেখে মনে হলো না পলির কথাগুলো তাঁর কানে গেছে।

'অনেক ঢং হয়েছে, এমিলি চাচী,' জন বলল। 'দেখতেই তো পাচ্ছ– দুজনেই আমরা জীবিত।'

এবার যেন এমিলি চাচীকে একটু বিস্মিত হতে দেখা গেল। 'জীবিতই যদি হও তবে কেন এসেছ এখানে? তোমার

বাবা বলেছিলেন তুমি নাকি কখনও এ বাড়িমুখো হবে না– অবশ্য যদি না তোমাকে কবর দেয়ার প্রয়োজন হয়। তুমি কি কবরস্থ হতে এসেছ, জন?'

জন কঠিন সুরে বলল, 'আমি এসেছি আমার সম্পত্তি কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে। দাদা মারা গেছে ছয় মাস হলো। বিশ্বাস বংশের একমাত্র জীবিত উত্তরাধিকারী এখন আমি, তুমি নও। কাজেই এ বাড়িতে যা ধন সম্পত্তি রয়েছে সব আমার।'

এমিলি চাচীর আঙুলগুলো হালকা ভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে পিয়ানোর গায়ে। রকিং চেয়ারে তখনও নির্জীব ভঙ্গিতে বসে আছে মেরী চাচী। খুদে একটা জন্তু যেন, কুতকুতে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছে ওদের দিকে।

'আচ্ছা! তুমি তা হলে জানো টম মারা গেছে। জানবেই তো। নিশ্চয়ই পরলোকে গিয়ে টম তোমার দেখা পেয়েছে। তাই হবে। মৃতরাই কেবল মৃতদের দেখতে পায়।'

'ফালতু কথা অনেক হয়েছে, আর না।' জন ততক্ষণে বিরক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। 'দু'জনেই আমরা ক্লান্ত। খিদেও লেগেছে বেশ। উপরে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করো।... পলি, ল্যাম্পটা হাতে নাও। বিড়ালের চোখ ওঁদের, অন্ধকারে গায়ে লাগবে না।'

ব্যাগদুটো তুলে জন হাঁটা শুরু করল। বাতি হাতে পলি দ্রুত তাকে অনুসরণ করতে লাগল। পেছন থেকে এমিলি চাচীর গলা শুনতে পেল ওরা।

'ওদের জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করো, মেরী। অবশ্য ওরা যদি ভান করতে চায় ওরা বেঁচে আছে... কী আর করা! তবে আমি ভেবে অবাক হচ্ছি মেয়েটার মৃত্যু হলো কীভাবে? আহা, বেচারি!'

*

দোতলার ড্রইংরুমে ওদের জন্যে নাস্তার আয়োজন করল মেরী চাচী। ওমলেট, সালাদ, রুটি আর চা। ঘরটা প্রশস্ত, এক পাশে লম্বা দরজা। পায়ের নীচে জীর্ণ কার্পেট। জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। এক কোণে রাখা ডাইনিং টেবিলটার অবস্থাও করুণ। ঘুণে ধরা; একটু নাড়া লাগলেই মনে হয় এই বুঝি কোমর ভেঙে ধসে পড়বে।

দেয়ালে কতগুলো অয়েল পেইন্টিং ঝোলানো– বিশ্বাস বংশের পূর্ব পুরুষদের ছবি ওগুলো। ল্যাম্পের ম্লান আলোয় স্থির চোখগুলো তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ধূর্ত, ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টি।

পেটে খাবার পড়তেই প্রসন্ন হয়ে উঠল জনের মন। পলিও ইতিমধ্যে খানিকটা সামলে উঠেছে– যদিও পুরোপুরি ধাতস্থ হয়ে উঠতে পারেনি এখনও। খানিক পরপরই ঝড়ো হাওয়া ছাপিয়ে প্যাঁচার অশুভ ডাক শোনা যাচ্ছে। থেকে থেকে চমকে উঠছে তরুণী।

'জন, এখানে আমরা থাকতে পারব না,' অবশেষে দ্বিধা কাটিয়ে বলে উঠল সে। 'আমার শখ মিটে গেছে, এই ভূতুড়ে পরিবেশ একেবারে সহ্য হচ্ছে না। তুমি না বলেছিলে কক্সবাজারের কোথায় তোমার বাপদাদার ভিটে– অথচ নিয়ে এলে কোথায়?'

'নুলিয়াছড়ি কক্সবাজার থেকে বেশি দূরে নিশ্চয়ই নয়,' জন বলল। 'মাত্র এক ঘণ্টার রাস্তা।'

'এক ঘণ্টা না কচু! মনে হচ্ছে কক্সবাজার থেকে একহাজার মাইল দূরে চলে এসেছি।'

'আজকের রাতটাই তো, সোনা,' জন সান্ত্বনার সুরে

বলল। 'আগামীকাল সকাল নাগাদ সমস্ত সম্পত্তি আমার হাতের মুঠোয় এসে পড়বে। তারপর এক মুহূর্তও এই প্রেতপুরীতে নয়– সোজা ঢাকার পথে হাওয়া হয়ে যাব।'

'যত জলদি সম্ভব এখান থেকে সরে পড়া যায় ততই ভাল।' পলির গলা একটু কেঁপে উঠল। জোর দিয়ে বলল, 'তবে আমি বলছি এখানে কোনও টাকা পয়সা নেই। থাকতে পারে না।'

'আছে। থাকতেই হবে,' জন চায়ে চিনি ঢালতে ঢালতে বলল। 'বিশ্বাস বংশের সব কথা পুরোপুরি কখনও বলেছি তোমাকে? আমার গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ড ফাদার ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ জলদস্যু। কক্সবাজার, মহেশখালি, টেকনাফ এমনকী সুদূর বার্মার সমুদ্র সীমানাতেও জলদস্যুতা করে বেড়াতেন তিনি।

'এক সময় এই জায়গাটা তাঁর নজরে পড়ে। নির্জন, নিরিবিলি পরিবেশ। লোকালয়ও তখন ছিল বহু দূরে। নৌপুলিশ ধাওয়া করলেও এখানে এসে গা ঢাকা দেয়া যাবে। কাজেই এখানে বাড়িটা তুললেন তিনি। ডাকাতি করে বহু টাকার মালিক হয়েছিলেন, পরবর্তী বংশধরেরা এখনও তা খেয়ে শেষ করতে পারেনি। ওই সব টাকা পয়সার অবশিষ্টাংশ এখনও পড়ে আছে এই বাড়ির কোথাও। বিশ্বাস বংশের কেউ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখতে ভরসা পেত না। এখন বড় ভাই না থাকায় বুড়িটা নিশ্চয়ই সব কিছু আগলে বসে আছে।'

'কিন্তু অত সহজে বুড়ি তোমাকে এক কানা কড়িও দেবে না। তোমাকে ঘৃণা করে সে।'

'আর কোনও উপায়ও তার নেই।' জন হাসল। 'আমার দ্বাদশ জন্মবার্ষিকীর দিন থেকেই এমিলি চাচী আমার শত্রুতে

পরিণত হয়েছে। ওই একই দিনে আমার দাদু জুলস বিশ্বাসকে কবর দেয়া হয়েছিল। একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল সেদিন। কবর দেয়ার সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়ে যাবার পরে কী এক কারণে তাঁর কফিনের ডালাটা খুলতে হয়েছিল। অদ্ভুত ব্যাপারটা ধরা পড়ে তখনই। দাদুর লাশটা উপুড় হয়ে পড়েছিল। অথচ পরিষ্কার খেয়াল আছে, কফিনে লাশটা চিৎ করেই শোয়ানো হয়েছিল।'

'জ-ন!'

'ডোন্ট বি আপসেট, হানি। বিশ্বাসদের ইতিহাস ঘাঁটলে এরকম অনেক উদ্ভট, ব্যাখ্যাতীত ঘটনার মুখোমুখি হবে তুমি। বাবার কথাই বলি। তাঁকে যখন কবর দেয়া হয়, তাঁর কফিনের ভেতর একটা টেলিফোন সেট ভরে রাখা হয়েছিল। সত্যিকারের টেলিফোন; সচল। বাবা ভেবেছিলেন মৃত্যুর পরেও যদি তিনি কফিন থেকে বেরিয়ে আসতে চান, সেক্ষেত্রে টেলিফোনটা তাঁর কাজে আসবে। মরার আগে সেরকমটাই বলে গিয়েছিলেন তিনি।... পলি, একবার জানালার কাছে এসো তো। জিনিসটা তোমাকে দেখানো দরকার।'

জন চেয়ার ছেড়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়াল, রশি টেনে সামান্য ফাঁক করল পর্দা। এখান থেকে বাড়ির পেছনটা দেখা যায়। ঘুটঘুটে অন্ধকার, একটু একটু বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছে। তবু প্রায় একশো গজ দূরে আবছা সাদা অবয়বটা ঠিকই পলির চোখে পড়ল। কোনও দেয়াল টেয়াল হবে হয়তো, অনুমান করল পলি। কিছু বলতে যাচ্ছিল জন, থেমে গেল। অকস্মাৎ ঢাকা পড়ে গেল দেয়ালের খানিকটা অংশ, একটা ছায়ামূর্তির উদয় ঘটল সেখানে। অন্ধকারে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। ধীর পায়ে ছায়ামূর্তিটা এগোচ্ছে বাড়ির দিকে।

'এমিলি চাচী!' জন অবাক হয়ে বলল। 'বুড়ি গোরস্থানে কী করতে ঢুকেছিল?'

'গোরস্থান?'

'বাড়ির আশেপাশে এত জলাভূমি যে বিশ্বাসদের কফিন মাটিতে পোঁতার রেওয়াজ কখনও হয়নি। সেজন্যেই ওই স্পেশাল ব্যবস্থা। ওই যে আবছামত ঘরটা দেখা যাচ্ছে, মার্বেল পাথরের তৈরি দুইস্তর বিশিষ্ট ভল্ট ওটা। নীচের স্তরটা মাটির তলায়– সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে নামার জন্যে। আমার প্রয়াত দাদু একটা হাইড আউট হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে বানিয়েছিলেন ওটা, যদিও শেষ পর্যন্ত পারিবারিক কবরখানা হিসেবে টিকে গেছে।'

অকস্মাৎ সবকিছু আলোকিত করে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। এক সেকেন্ড পরেই সশব্দে বাজ পড়ল কোথাও। দ্রুত কানচাপা দিল পলি।

আরও ফুঁসে উঠেছে বাতাস।

'ঝড় আসছে, বৃষ্টিও বেড়ে যাবে মনে হয়,' জন বলল। ফিরে এসে চেয়ার টেনে বসল আবার। 'ওয়েদার ব্রডকাস্টিং-এও এমনটাই বলা হয়েছিল। সমস্যাটা কী জানো, মুষলধারে বৃষ্টি হলে বাড়ির চারদিকটা দুই থেকে তিনফুট পানির নীচে তলিয়ে যায়। বৃষ্টি থেমে যাবার পরেও পানি নেমে যেতে প্রায় দুই দিন সময় নেয়। পুরো বাড়িটা তখন দ্বীপের মত ভেসে থাকে। বলা যায় না, সে রকম কিছু হলে আমাদের হয়তো পানিবন্দী হয়েই থাকতে হবে।'

'জন, না! যে ভাবেই হোক কাল-ই এ বাড়ি ছাড়ব আমরা। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

'টেক ইট ইজি, ওরকম নাও তো হতে পারে...যাক্‌গে,

তোমাকে তো এমিলি চাচীর কথা বলছিলাম। যেদিন দাদুকে ওই ভল্টের নীচে কবর দেয়া হয়, এমিলি চাচী-ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সবাই ভল্ট থেকে বেরিয়ে আসার পরে চুপিসারে ভেতরে ঢুকেছিলেন। আমি তখন কচি খোকা। অনেকটা বেখেয়ালেই ভল্টের প্রবেশ দ্বার লক্ করে দিয়েছিলাম। বাড়ি ভর্তি লোকজন, অথচ পরদিন সকাল পর্যন্ত কেউই এমিলি চাচীর অনুপস্থিতি টের পায়নি। পুরো একটা রাত ওই ভল্টে আটকে ছিল বুড়ি। এবং ওই রাতেই নাকি সে শুনতে পেয়েছিল দাদুর কণ্ঠস্বর। কফিন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সাহায্য চাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু এমিলি চাচী সে অনুরোধে কান দেয়নি। তাঁর যুক্তি হচ্ছে মরা লোকের ডাকে কান দেবার কোনও মানে হয় না। যা হোক, ওই দিন থেকে তাঁর মনে ধারণা জন্মায় যে সে মৃতদের সাথে কথা বলতে সক্ষম।'

'জন!' সাদা হয়ে গেছে পলির মুখ, থর থর করে কাঁপছে সে। 'তুমি–'

'মনে করো ঠাট্টা করছি তোমার সাথে।' জন মৃদু হাসল। 'গল্পের শেষ এখনও হয়নি। দাদুর সাথে চাচীর কথোপকথন সংক্রান্ত এই গল্পে প্রথমে কেউ কান দেয়নি। কিন্তু শেষমেশ কৌতূহল জন্মাল বাবার মনে। ভল্টের ভেতর ঢুকে দাদুর কফিনের ডালাটা খুললেন তিনি। সবাই আমরা দেখলাম দৃশ্যটা। উপুড় হয়ে পড়ে আছে দাদু। ডালার গায়েও স্পষ্ট ফুটে উঠেছে নখের আঁচড়ের চিহ্ন।'

'জন, স্টপ ইট!' পলি আর্তনাদ করে উঠল। 'আমি– আমি অসুস্থ বোধ করছি, জন। ঈশ্বরের দোহাই, বন্ধ করো এসব ভূতুড়ে গল্প। আর সহ্য হচ্ছে না আমার–' দুহাতে মুখ ঢাকল সে।

'প্রায় শেষ হয়ে এসেছে গল্প। যদিও এর প্রতিটি কথাই সত্যি। দাদুর কাণ্ড দেখে বাবা বোধহয় বেশ ঘাবড়েই গিয়েছিলেন। কোনও রিস্ক নিতে চাননি উনি। তাঁর নির্দেশেই মৃত্যুর পরে তাঁর কফিনে টেলিফোনটা রাখা হয়। ঠিক তাঁর মাথার পাশেই... প্রয়োজনে যাতে তিনি ফোনের মাধ্যমে সাহায্য চাইতে পারেন। আচ্ছা, এসব প্রসঙ্গ থাক। আমরা এখন এমিলি চাচীর সাথে কথা বলব। তার আগে অবশ্য একটা জরুরী কাজ সারতে হবে।'

জন আসন ছেড়ে দেয়ালের ধারে এসে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে বাবার পোর্ট্রেটটা নামাল সে। এখন সেখানে একটা আয়রন সেফ্ দেখা যাচ্ছে। মুখটা বন্ধ। জন কম্বিনেশন মেলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রায় সাথে সাথেই খুট্ করে খুলে গেল সেফের ডালা।

'সেই পুরানো কম্বিনেশন-ই রয়ে গেছে দেখছি!' জনের কণ্ঠে উল্লাস। 'শেষবার এটা খুলেছিলাম এ বাড়ি ছেড়ে যাবার আগের রাতে। একেবারে খালি পকেটে তো আর গৃহত্যাগ করা যায় না, কী বলো? এখন দেখি কী পাওয়া যায় এর ভেতর।'

ক্যাশবাক্সটা টেনে বের করে টেবিলের ওপর রাখল সে। ড্রয়ারটা খুলতে বেশ বেগ পেতে হলো তাকে। অবশেষে ক্ষিপ্র হাতে ভেতর থেকে একটুকরো কাগজ বের করল জন। ভাঁজ খুলে দ্রুত চোখ বুলাল। অকস্মাৎ পেছনে কারও পায়ের শব্দ কানে যেতেই ঝট্ করে মুখ তুলল সে। ঘাড় ঘুরে গেল দুজনেরই। এমিলি বিশ্বাসকে দেখা গেল দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে।

'কী করছ, জন? কেন তুমি তোমার বাবার আয়রন সেফে হাত দিলে?'

'কৌতূহল, এমিলি চাচী.' জন মৃদু সুরে বলল। 'দারুণ ইন্টারেস্টিং একটা ডকুমেন্ট।' হাতের কাগজটা নাড়ল সে। 'মানি রিসিপ্টের ডুপ্লিকেট কপি এটা। বলছে টমের যাবতীয় সম্পত্তির সেটেলমেন্ট বাবদ কোন্ এক চৌধুরী অ্যান্ড চৌধুরী মাস পাঁচেক আগে নগদ এক কোটি টাকা তোমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছে।'

'ঠিক, জন। কিন্তু তাতে হলোটা কী?'

'হলো কী মানে?' জন খেঁকিয়ে উঠল। 'টাকাটা আমার। আমি চাই ওই টাকা। কোথায় রেখেছ?'

'নিরাপদে আছে. জন,' নির্বিকার মুখে বলল এমিলি চাচী। 'নিরাপদেই আছে। তা তুমি যখন নিজেকে এতই চালাক ভেবে থাকো, নিজেই খুঁজে বের করছ না কেন?'

'খুঁজবই তো। আরেকটা কথা– কিছুক্ষণ আগে ভল্টের ভেতর ঢুকেছিলে কেন তুমি?'

'তোমার ভাই টমের সাথে কথা বলতে গিয়েছিলাম। ঠাণ্ডা কফিনের ভেতরে বাছা আমার একাকী শুয়ে আছে, একটু গল্পগুজব করে ওঁকে চাঙ্গা করে তুললাম আর কী। যেভাবে প্রায়ই আমি কথা বলি তোমার বাবার সাথে, তোমার দাদুর সাথে...জন, বুঝেছ, তোমার দাদুর সাথে।'

'জন, ওঁকে চুপ করতে বলো!' পলি চিৎকার করে উঠল। 'বন্ধ করতে বলো এসব স্টুপিড্ কথাবার্তা!'

'গালগল্প অনেক হয়েছে, এমিলি চাচী.' জন গলা চড়াল। 'এখন সোজাসাপ্টা বলো, টাকাগুলো কোথায় রেখেছ?'

বুড়ি ধূর্ত দৃষ্টি মেলে সরাসরি জনের চোখে চোখ রাখল।

'কেন টাকা চাইছ, জন? তুমি তো মৃত। মরা মানুষ টাকা দিয়ে কী করবে?'

জোরে শ্বাস টানল জন।

'ঠিক আছে, এমিলি চাচী, তুমি-ই আমাকে বাধ্য করলে কঠিন হতে। এখন আমি কী করব জানো? এই চেয়ারটার সাথে তোমাকে কষে বেঁধে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরব তোমার কপালে।'

'হুমকি দেয়ার কোনও প্রয়োজন নেই, জন। আমি বলব টাকার হদিস। একটু আগে টমের সাথে এ নিয়েই তো কথা হলো। টাকার কথা তোমাকে জানাতে ওর-ও নাকি কোন আপত্তি নেই।'

'তাই? শুনে কৃতার্থ হলাম। তা হলে বলো তাড়াতাড়ি!'

'ওই ভল্টের ভেতরই। যেখানে খোঁজার কথা চোরেরও মনে আসবে না। ভল্টের নীচে যেখানে তোমার পূর্বপুরুষরা সবাই ঘুমিয়ে আছে– তোমার দাদু, তোমার বাবা, তোমার ভাই...ওখানেই তোমার জন্যেও একটা শূন্য কফিন অপেক্ষা করছে, জন! টাকাগুলোও আমি ওখানে রেখেছি– তোমার কফিনের ভেতর।'

জন হো হো করে হেসে উঠল।

'এক কোটি টাকা কিনা অপেক্ষা করছে আমার নিজেরই কফিনের ভেতরে। বলেছিলাম না, পলি, বিশ্বাস বংশের ব্যাপার স্যাপারই আলাদা!'

'চলো এক্ষুণি যাই,' প্রায় মিনতি ভরা কণ্ঠে পলি বলল। 'পানি বাড়ার আগেই এসো কাজ শেষ করে ফেলি।'

'হ্যাঁ জন, তোমাকে দ্রুত কাজ সারতে হবে।' অদ্ভুত ঠাণ্ডা শোনাল এমিলি চাচীর কণ্ঠ। 'বৃষ্টির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ না? খেয়াল করেছ কী রকম বইছে দমকা হাওয়া? পানি বাড়ছে, জন। হয়তো এরই মধ্যে নীচের ভল্টে পানি জমে গেছে।

অবাক হয়ো না। এককালে ওয়াটার প্রুফ করে বানানো হলেও ভল্টের অবস্থা এখন আর সেরকম নেই। সামান্য বৃষ্টিতেই পানি ভেতরে ঢুকে পড়ে।'

'ঠিক বলেছ, এমিলি চাচী, সত্যি-ই সময় বেশি নেই,' জন বলল। 'আর হ্যাঁ, যদি এতটুকু মিথ্যে বলে থাকো তো পরে পস্তাবে তুমি।'

'একটা মরা মানুষের সাথে কেন আমি মিথ্যে বলতে যাব, জন? একবার যদি স্বীকার করতে তুমি মৃত– তুমি আর তোমার সঙ্গিনী– বিশ্বাস করো আমরা বন্ধু হতে পারতাম। গল্প করে চমৎকার সময় কাটত আমাদের। যেমনটা কাটাই আমি টমের সাথে।'

'জন!' পলি তাড়া লাগাল। 'তুমি নড়বে এখান থেকে? পাগল হবার আগে এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে চাই আমি।'

'হ্যাঁ, চলো। তার আগে নীচের রান্নাঘর থেকে কুড়ালটা নিয়ে নিই। আর হ্যাঁ, মনে করে গাড়ির ড্যাশবোর্ড থেকে টর্চটাও বের করে নিয়ো।'

বাজ পড়ার বিকট শব্দ হলো। এবার আরও কাছে। পুরো বাড়িটা কেঁপে উঠল একবার। বাইরে ততক্ষণে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টির ধারা নেমেছে। অদূরে ঝাউগাছগুলো যেন পাগলের মত উড়ে যেতে চাইছে। কেবল মার্বেল পাথরের তৈরি ভল্টের ভেতরে ঢোকার পরেই একটু নিরাপদ বোধ করল ওরা। যদিও জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে আর ঠাণ্ডা। বদ্ধ বাতাসে ভারী, গুমোট গন্ধ।

অন্ধকার চিরে জ্বলে উঠল জনের টর্চ। পাথরের দেয়ালে খাঁজ কেটে কতগুলো তাক বানানো হয়েছে। কয়েকটা খালি,

বাকিগুলো ভরা হয়েছে কফিন দিয়ে।

'বিশ্বাস বংশের মহিলা আর শিশুদের এখানে কবর দেয়া হয়েছে,' গম গম করে উঠল জনের কণ্ঠ, ভৌতিক আর অপার্থিব শোনাল পলির কানে। জন বলে চলল, 'আর পুরুষরা শুয়ে আছে নীচের ভল্টে। পাথরের একটা স্ল্যাব ফাঁক করে ভেতরে ঢুকতে হবে আমাদের। ওটা সরাব এখন, তুমি বরং টর্চটা ধরো।'

জন দেয়াল ঘেঁষে এক কোণে হাঁটু গেড়ে বসল। দ্রুত হাত বুলোতে লাগল দেয়ালের গায়ে। কী যেন খুঁজছে সে···ক্লীক করে শব্দ হলো একবার। পলি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল জনের সামনে পাথুরে মাটিতে চিড় ধরেছে। এরপরের দৃশ্যটা দেখার জন্যে প্রস্তুত ছিল না মেয়েটা। আর একটু হলে টর্চটা হাত থেকে পড়েই যাচ্ছিল। কর্কশ, ধাতব প্রতিবাদ করে ধীরে ধীরে ফাঁক হতে লাগল পাথরটা। একটা আয়তাকার সুড়ঙ্গের সৃষ্টি হলো সেখানে। থেমে গেল ভোঁতা গর্জন। পলি ভয়চকিত দৃষ্টিতে তাকাল সুড়ঙ্গের মুখে। এক টুকরো অশুভ অন্ধকার বাসা বেঁধে আছে সেখানে।

'ওকে,' জন সন্তুষ্ট চিত্তে বলল। পলির হাত থেকে টর্চ নিয়ে ভেতরে আলো ফেলল সে। পাথরের তৈরি রুক্ষ, এবড়োখেবড়ো, অমসৃণ সিঁড়িটা হারিয়ে গেছে পাতালে। 'আমার পেছন পেছন এসো, পলি। বেসমেন্টে রাখা সেফ ডিপোজিট বাক্স হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমাদের।'

করুণ শোনাল পলির কণ্ঠ। 'জন, তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি না হয় এখানেই অপেক্ষা করি। ভেতরে নিশ্চয়ই খুব ঠাণ্ডা। আমার সহ্য হবে না।'

'সামান্য ঠাণ্ডায় তোমার সোনার যৌবন ক্ষয় হবে না,

ডার্লিং! চলো, চলো– ভেতরে তোমারও কাজ আছে। টর্চ ধরে থাকবে তুমি...দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চলো!' জন তাড়া লাগাল। একটা পা তার ততক্ষণে সুড়ঙ্গের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে। দুই হাতে দুই পাথুরে প্রান্ত ধরে আস্তে আস্তে গোটা শরীরটা ভেতরে নিয়ে এল সে. কয়েক ধাপ নেমে পলিকে ঢোকার রাস্তা করে দিল একই ভঙ্গিতে পলিও অনুসরণ করল তাকে। কাঁপছে সে, একটু ঝুঁকে খামচে ধরল জনের কাঁধ। নরম মাংসে প্রায় গেঁথে গেল পলির নখ ধীরে ধীরে আন্ডারগ্রাউন্ড ভল্টে নেমে এল ওরা। কফিনের সংখ্যা এখানে অনেক কম। মাত্র পাঁচটা, মেঝের ওপর সারি বেঁধে রাখা হয়েছে।

পাথর চুইয়ে বৃষ্টির পানি ভল্টের কঠিন মেঝেতে এসে জমেছে। এরই মধ্যে দুই ইঞ্চি পুরু হয়ে উঠেছে পানির স্তর। নোংরা, তেলতেলে রং, পলির গা গুলিয়ে উঠল।

সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে থেকেই বলে উঠল সে, 'প্লীজ জন, আমি এখান থেকেই টর্চ ধরি। তোমার কোনও অসুবিধা হবে না, দেখো।'

'ঠিক আছে।' জন শ্রাগ করল। 'এদিকে একটু আলোটা ফেলো তো...গুড, হয়েছে...' এই তো বড় বাবার কফিন। এর ঠিক পাশে...হুম্, দাদুর কফিন... জন আপন মনে বলে চলল, 'দাদু জুলস বিশ্বাস– এই ব্যাটার লাশ-ই তো কফিনের ভেতর আপনাআপনি উল্টে গিয়েছিল– জন্ম ১৮৯৬, মৃত্যু ১৯৭৪।' জন কফিনের গায়ে আটকানো পেতলের নেম প্লেটটা পড়ল। 'আর এই তো বাবার কফিন... এখনও নিশ্চয়ই ভেতরে রয়েছে টেলিফোনটা...পিটার বিশ্বাস। জন্ম ১৯৩০, মৃত্যু ১৯৯২। এর পরেরটা বড় ভাই-এর কফিন দেখছি।... আরে,

আরে, এটার গায়ে দেখছি আমার নাম লেখা। নিশ্চয়ই আমার জন্যে রাখা হয়েছে...জন বিশ্বাস। জন্ম ১৯৬২–

হঠাৎ থেমে গেল জন। একটু কেঁপে উঠল সে। পলি ব্যগ্র কণ্ঠে বলল, 'কী হলো, জন?'

জন সামলে নিল নিজেকে। শান্ত স্বরে বলল, 'এ নিশ্চয়ই এমিলি চাচীর ফাজলামো আর কী! নেম প্লেটে লেখা আছে– জন বিশ্বাস। জন্ম ১৯৬২, মৃত্যু ১৯৯৯। ছুরি দিয়ে আঁচড় কেটে লেখা। বোঝাই যাচ্ছে খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে সারা হয়েছে কাজটা। দাঁড়াও, বের হয়ে নিই একবার। বুড়িটার সাথে একটা বোঝাপড়া না করলেই নয়...'

'এ নিয়ে আর সময় নষ্ট কোরো না, লক্ষ্মীটি। এসব এখন কোনও জরুরী ব্যাপার নয়। আগে টাকাগুলো বের করো। প্লীজ জন, প্লীজ! এই নরকে আমি আর বেশিক্ষণ টিকতে পারব না।'

'আচ্ছা-আচ্ছা,' জন অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল। 'আমি কফিন খুলছি। তুমি আলোটা ভাল করে ফেলো এদিকে।'

দ্রুত কফিনের সবগুলো স্ক্রু খুলে ফেলল জন। নোংরা পানিতে হাঁটু ডুবিয়ে অনেক কষ্টে ডালাটা এক পাশে সরাল। টর্চ ধরা হাতটা আরও খানিকটা সামনে বাড়াল পলি। নিমেষে সমস্ত শঙ্কা দূর হয়ে গেছে তার। জনের মত তাকেও গ্রাস করেছে লোভ আর উত্তেজনা।

কফিনের ভেতর থরে থরে সাজানো নোটের বান্ডিল। বোঝাই যায় অনেক যত্ন নিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ওগুলো। টাকার একটা বান্ডিল হাতে নিল জন, দ্রুত হিসেব করতে লাগল।

'একশোটা পাঁচশো টাকার নোট...তার মানে প্রতি বান্ডিলে

পঞ্চাশ হাজার···মোট দুশোটা বান্ডিল···অর্থাৎ এক কোটি টাকা···মাই গড্! এমিলি চাচী তা হলে মিথ্যে বলেনি। এখন বয়ে নিই কীভাবে? দ্য আইডিয়া···!'

জন ক্ষিপ্র হাতে পুরনো জ্যাকেটটা খুলে ফেলল।

'এবার হয়েছে,' হাতের জ্যাকেটটা ঝোলার মত দুলোতে দুলোতে বলল সে। 'হাত লাগাও, পলি! পানিতে পা ডুবোতে আর লজ্জা করো না। এক কোটি টাকার জন্যে খানিকটা সর্দি ঝরলে কী-বা যায় আসে!'

পলি সন্তর্পণে নোংরা পানিতে এসে দাঁড়াল। জনের দিকে এক পা বাড়িয়েছে মাত্র, অকস্মাৎ সিঁড়ির মাথায় মৃদু ক্লীক শব্দ হতেই পাথরের মত জমে গেল সে।

পরক্ষণেই খানিক আগে শোনা সেই পরিচিত কর্কশ শব্দ তুলে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল সুড়ঙ্গের মুখ।

পলি আর্তনাদ করে উঠল। পাথরের ভারী দেয়ালে বাড়ি খেয়ে দ্বিগুণ গতিতে ফিরে এল তার চিৎকার। কেঁপে উঠল ভল্টের বদ্ধ পরিবেশ।

শরীরের সমস্ত রোম খাড়া হয়ে গেল জনের।

'এমিলি চাচী!' সে-ও গলা ফাটিয়ে ডাকল। 'হারামজাদী বুড়ি নিশ্চয়ই স্ল্যাবটা টেনে দিয়েছে!'

পানিতে থপ্ থপ্ শব্দ তুলে দৌড় দিল জন, দ্রুত উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। প্রবেশমুখটা বন্ধ। মার্বেল পাথরে হাত রাখল সে, একটু একটু করে চাপ বাড়াতে লাগল। এক চুলও আল্গা হলো না ওটা।

শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ করছে জন···মুখের রং বদলে অস্বাভাবিক লাল হয়ে উঠল দেখতে দেখতে। ঘেমে নেয়ে গেছে গোটা শরীর।

'এমিলি চাচী! এমিলি চাচী!' জন আবার পাগলের মত চিৎকার করে উঠল।

অনেক দূরে কে যেন খনখনে গলায় হেসে উঠল। ক্রমশ আরও দূরে সরে যাচ্ছে। পেছনে ছড়িয়ে যাচ্ছে এক রাশ আতঙ্ক।

'জন!' পলির গলা কাঁপছে। 'জন, ওই বুড়িটা আমাদের আটকে দিয়েছে। ইঁদুরের গর্তে বন্দী হয়েছি আমরা। কখনও আর এখান থেকে বের হতে পারব না– কক্ষনো না– না–'

পলির গলা আটকে গেল, হিস্ট্রিয়া রুগীর মত সারা দেহ কাঁপছে তার। স্থির রাখতে পারছে না নিজেকে– সে চেষ্টাও করছে না। জন তাড়াতাড়ি নেমে এসে ধরল তাকে। ঘোর লাগা দৃষ্টিতে ওকে দেখল পলি

'শান্ত হও!' জোরে বারকয়েক ঝাঁকি দিল তাকে জন। 'এভাবে কাঁপাকাঁপি করলে কোনও লাভ হবে না। নিশ্চয়ই বুড়ি ঠাট্টা করছে আমাদের সাথে। তবে আমরাও বসে থাকব না। কুঠারটা তো রয়েছেই। তুমি টর্চ ধরে রাখো। আমি স্ল্যাবটা ভাঙতে যাচ্ছি।'

ঘোর লাগা ভাবটুকু খানিকটা কেটে গেছে, লক্ষ্মী মেয়ের মত মাথা নাড়ল পলি। এদিকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে শক্ত পাথরের গায়ে জন সর্বশক্তি প্রয়োগ করে কুঠার চালাতে লাগল। পাথরের মিহি গুঁড়ো এসে পড়ছে তার চোখে মুখে, পাত্তা দিল না সে। দ্বিগুণ উৎসাহে একের পর এক বাড়ি মেরে যাচ্ছে।

পাথরে নয়, কখন যেন চিড় ধরেছে কুঠারের হাতলে, জন খেয়াল করেনি। অকস্মাৎ কিছু বুঝে ওঠার আগে তার হাত থেকে ছুটে গেল কুঠারটা. উড়ে গিয়ে পড়ল অন্ধকারে পানির নীচে।

'খোঁজো ওটা!' জন চিৎকার করে উঠল। পলি পানি উপেক্ষা করে মেঝেতে হাত ডোবাল।

'পাচ্ছি না, জন!' খানিকক্ষণ হাতিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল সে। 'সত্যি আমি ওটা খুঁজে পাচ্ছি না।'

খ্যাপার মত নেমে এল জন, পানিতে হাত আর হাঁটু ডুবিয়ে দিল। হামা দিয়ে পাগলের মত খুঁজতে লাগল কুঠারটা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ওভাবে সঙের মত দাঁড়িয়ে থেকো না। ঘেন্না পিত্তির সময় না এখন। হাত লাগাও, খোঁজো!'

অগত্যা ইতস্তত ভাবটা ঝেড়ে ফেলতে হলো পলিকে, জনের মত সেও উবু হয়ে পানি হাতড়াতে শুরু করল। সম্পূর্ণ বদলে গেছে ওদের চেহারা। অবিন্যস্ত চুল, নোংরা পানি লেগে গায়ের সাথে লেপ্টে গেছে পরনের পোশাক। অবশেষে পলি-ই খুঁজে পেল কুঠারটা। ওর হাত থেকে একরকম কেড়েই নিল ওটা জন। আবার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল সে। বাড়ি লাগাল শক্ত পাথরের গায়ে।

ঝাড়া পনেরো মিনিট একনাগাড়ে বাড়ি মেরে অবশেষে থামল জন। প্রচণ্ড হতাশা আর ক্লান্তিতে ঝুলে পড়ল মাথা। পাথরের গায়ে সামান্য আঁচড়ের সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। আশান্বিত হবার মত কিছু না।

'তিন ইঞ্চি,' জন নির্লিপ্ত সুরে বলল। 'এভাবে কাজ হবে না। কম করেও তিন ইঞ্চি পুরু স্ল্যাব।' থেমে গেল সে। কপাল কুঁচকে কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ। হঠাৎ পাগলের মত হেসে উঠল ও– কোনও রকম জানান না দিয়েই। হাসতে হাসতেই একরকম গড়িয়ে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। দাঁড়াল পলির সামনে।

'বাবা!' কোনওরকমে হাসি চেপে জন বলে উঠল, 'মানে

বাবার কফিনে– সত্যি বলছি···দেখবে এসে।'

জনের নির্দেশিত কফিনের ওপর টর্চ মেলল পলি। চকচক করে উঠল পেতলের নেম প্লেট। পিটার বিশ্বাস। জন্ম ১৯২৫, মৃত্যু ১৯৯২। টেলিফোনের তারটাও পরক্ষণেই নজরে পড়ল তার। কফিনের গায়ে তৈরি একটা সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ থেকে বেরিয়ে এসে হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। এদিকে কফিনের ওপর প্রায় হামলে পড়ল জন। জং ধরেছে স্ক্রুগুলোতে। বেশ সময় নিল ওগুলো ছাড়াতে। অবশেষে ডালাটা একপাশে সরিয়ে দিল জন। অস্ফুট শব্দ করে উঠল পলি। থর থর করে কাঁপছে সে। ওর দিকে তখন খেয়াল নেই জনের। বিজয় উল্লাসে জ্বলজ্বল করছে তার চোখজোড়া।

পিটার বিশ্বাস শুয়ে আছে– বলা ভাল তাঁর কঙ্কালটা। যদিও প্রায় পুরোটাই ঢাকা পড়ে গেছে পরনের শতচ্ছিন্ন কালো গাউনে। টর্চের আলোতে চক চক করছে খুলি। এখনও ক'গাছি চুল গেঁথে আছে সেখানে।

নিষ্প্রাণ একজোড়া অক্ষিবিহীন কোটর সরাসরি তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। পলির মনে হলো ওর বুকের ভেতরটা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাচ্ছে। মাংসবিহীন ঠোঁটের মাত্র দুই ইঞ্চি পাশে রক্ষিত কালো রঙের টেলিফোন সেট্‌টা চোখে পড়ল ওদের।

'দেখেছ!' উল্লাসে ফেটে পড়ল জন। 'বলেছিলাম না– বলেছিলাম না তোমাকে?··· বাবা আমাকে দেখতে পারতেন না, ঘৃণা করতেন। কিন্তু আজ উনি-ই আমাদের রক্ষা করবেন।' দ্রুত রিসিভারটা তুলল সে।

'কফিনের ভেতর টেলিফোন! কখনও শুনেছ?··· হ্যাঁ, কেবল বিশ্বাসদের মাথা থেকেই বের হতে পারে এরকম

আইডিয়া। থানার নম্বরটা জানো তুমি?... ওহ্হো তোমার তো জানার কথা না... কুছ পরোয়া নেই, এক্সচেঞ্জেই ডায়াল করি। ওরাই যোগাযোগ করবে থানার সাথে। ভয়ের কিছু নেই, ওরা বিশ্বাস করবে আমাদের কথা। এমিলি চাচীর খ্যাপাটে স্বভাবের কথা এ তল্লাটের সবাই জানে।'

জন ডায়াল ঘুরাচ্ছে, পলি সন্দেহের সুরে জিজ্ঞেস করল, 'এতদিন পরে সেট্‌টা কাজ করবে তো-'

'রিং হচ্ছে।' ওকে থামাল জন। 'কথা বলো না... হ্যালো... হ্যালো... অপারেটর? আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আপনি?'

'হ্যাঁ, শুনছি,' ও প্রান্ত থেকে নারী কণ্ঠে ঠাণ্ডা, নিরুত্তাপ জবাব ভেসে এল। 'অপারেটর, মন দিয়ে শুনুন। আমি জন বিশ্বাস বলছি। বিশ্বাস ভবন থেকে। বাড়িটা চেনেন তো? শহরের শেষ মাথায় জলাভূমিটা ঘেঁষে-'

'হ্যাঁ, চিনি,' জবাব এল।

'আমি সাহায্যপ্রার্থী। জলদি থানার সাথে যোগাযোগ করুন। পুলিশকে বলুন বিশ্বাসভবনের আন্ডারগ্রাউন্ড কবরস্থানে বন্দী হয়ে আছি আমরা- আমি আর আমার স্ত্রী। বুঝেছেন, এক্ষুণি যোগাযোগ করুন। কুইক!'

'হ্যাঁ, বুঝেছি।' ভাবাবেগ বর্জিত শান্ত কণ্ঠস্বর।

জন আবার বলে উঠল, 'বৃষ্টিতে ভেতরে পানি জমছে। এহারে বৃষ্টি হতে থাকলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ডুবে যাব আমরা। আপনি তাড়াতাড়ি থানায় খবর দিন। প্লীজ!'

'খবর দিচ্ছি। পুলিশ সময় মত পৌঁছে যাবে,' সেই একই রকম একঘেয়ে সুর ভেসে এল।

'বিশ্বাস ভবন। আন্ডারগ্রাউন্ড গোরস্থান-' জন দ্রুত

পুনরাবৃত্তি করল মেসেজটা।

'বুঝেছি। খবরও দিচ্ছি–'

ক্লিক!

কেটে গেল লাইন।

উত্তেজনায় জনের হাত কাঁপছে। কোনওমতে রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে তাকাল স্ত্রীর দিকে। মুখে একটুকরো দেঁতো হাসি।

'বড় জোর এক ঘণ্টা, পলি,' বলল সে। 'এক ঘণ্টার মধ্যেই মুক্ত হচ্ছি আমরা। তারপর– ওহ্ গড! এককোটি টাকা! তোমাকে আমি রাণী বানিয়ে রাখব, ডার্লিং। রাজার হালে কাটবে আমাদের আগামী দিনগুলো। অপেক্ষা করো. মাত্র একটা ঘণ্টা...'

একশো গজ দূরে প্রবল বর্ষণ আর বাতাসের প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্যে তখনও কাঁপছে পুরো বাড়িটা। দোতলার ড্রইংরুমে এমিলি চাচী শান্ত ভঙ্গিতে রিসিভার নামিয়ে রাখল। নির্বিকার মুখের ভাব, কোনও রকম উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও নেই।

'জনের ফোন, মেরী,' বলল বৃদ্ধা। 'মৃতের ভূমিকায় এখনও পুরোপুরি মানিয়ে উঠতে পারেনি। আমাকে অপারেটর ভেবে পুলিশের সাহায্য চেয়েছে। অতটা নির্দয় আমি নই। তাই আর বললাম না যে সে আর তার মেয়েছেলেটা এখন মৃত। কখনও বের হতে পারবে না ওখান থেকে। এটাই বোধ হয় ভাল হলো। ওরা ভাবতে থাকুক শিগগির পুলিশ এসে উদ্ধার করবে ওদের সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে উঠার আগ পর্যন্ত এ ভাবনাটুকু ওদের সময় কাটাতে সাহায্য করবে। পানি নেমে গেলে কাল বা পরশু ওখানে নামব আমি। কথা বলব ওদের

সাথে।... যাক্‌গে, ওদের প্রসঙ্গ বরং এখন বাদ দিই। এসো আমরা প্রার্থনা করি আমাদের প্রভুর নামে। নতুন উৎসাহে, নতুন উদ্যমে– যাতে শান্তি পায় জন আর ওর সঙ্গের মেয়েটা। এসো, আমরা গান ধরি।'

দুই বুড়ি গুটিগুটি পায়ে নীচে নেমে এল। এমিলি চাচী পিয়ানোর পাশে বসল। রকিং চেয়ারে গা এলিয়ে দিল মেরী চাচী।

বাইরে প্রকৃতির বিক্ষুব্ধ উন্মাদনা। দুই বৃদ্ধাকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হতে দেখা গেল না। প্রকৃতির সমস্ত তাণ্ডবকে উপেক্ষা করে নড়ে উঠল দুজোড়া শীর্ণ ঠোঁট। মৃদু অথচ মর্মভেদী কণ্ঠে গাইতে লাগল ওরা, 'যখন গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে ওঠে রাতের আঁধার– হে প্রভু, আমাদের সঙ্গ দাও...'

(বিদেশী কাহিনির ছায়া অবলম্বনে)

মাহবুবুর রহমান শিশির

কবর

ঘুম ভাঙতেই চোখ মেলল জন।

চারপাশে চাপ চাপ কুচকুচে কালো ঘন অন্ধকার। কোথাও কোনও শব্দ নেই। থমথমে নীরবতা।

ঢোক গিলতে গিয়ে বুঝল ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। উঠে বসতে গিয়ে শুয়ে পড়ল আবার। সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা। মাথাটা ছিঁড়ে পড়তে চাইছে।

কপাল টিপে ধরল ও। বুড়ো আঙুলের নীচে দপদপ করে লাফাচ্ছে কপালের শিরা।

দাঁতে দাঁত চেপে বসার চেষ্টা করল। কীসে যেন ঠুকে গেল মাথা।

কীসে?

শরীরের নীচে নরম একটা স্পর্শ। গদির। সন্দেহ নেই বিছানায় রয়েছে সে। কিন্তু... না, এ অসম্ভব, ছাদ এতখানি নেমে আসবে কী করে!

হাত তুলে ছাদে ঠেকাল ও। কেমন যেন মসৃণ আর নরম। চাপ দিলেই বেঁকে যাচ্ছে। যতদূর সম্ভব হাতড়ে দেখল জন। ছাদের শেষ সীমা পেল না। দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল। একই রকম নরম দেয়ালের বাধা দু'পাশে!

আতঙ্কে শিউরে উঠল সে, মনে হলো দম আঁকড়ে আসছে।

ঘসটে ঘসটে পেছানোর চেষ্টা করল। যেভাবে হোক বেরতে হবে এখান থেকে। বদ্ধ জায়গা ওর ভীষণ ভয়। সিডার স্প্রিঙসের ডাক্তার বলেছিল ক্লস্ট্রোফোবিয়া আছে ওর! এই রোগীরা কোথাও আটকা পড়লে আতঙ্কিত হয়ে মারাও যেতে পারে। ও মরতে চায় না।

পেছন দিকেও সেই নরম দেয়াল!

মাথা ঠেকে গেছে ওর!

পায়ের দিকে নিশ্চয়ই দেয়াল নেই?

শরীর এগিয়ে নিল ও। হাঁপাচ্ছে। পাগলা ঘোড়ার মত লাফ শুরু করেছে হৃৎপিণ্ড। বুকে তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণা।

আছে!

পায়ের দিকেও আছে ওই দেয়াল!

পায়ের পাতায় নরম মৃত্যুর মত ঠেকে গেছে শীতল প্রাচীর।

থরথর করে কেঁপে উঠল জন। আঁধারের দিকে চেয়ে রইল। ঘামছে দরদর করে। বড় একটা বাক্সে পুরে ওকে আটকে দিয়েছে উইলবার স্মিথ!

'প্রতিশোধ নিতে হবে,' ফিসফিস করে নিজেকে শোনাল জন। শান্ত থাকার চেষ্টা করল। গতি কমিয়ে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এল শ্বাসপ্রশ্বাস। ভাবতে হবে ওকে, বুদ্ধি করে বেরতে হবে এই ফাঁদ থেকে। শোধ নিতে হবে।

হঠাৎ মনে পড়তেই প্যান্টের পকেট হাতড়াল জন। চাবির গোছার ধাতব স্পর্শ আঙুলে পেল ও। আছে! দেয়াশলাইটাও আছে! কাঁপা হাতে কয়েকবারের চেষ্টায় একটা কাঠি জ্বালল সে। লালচে আভায় চারপাশে তাকাল।

বুক ফাটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল ওর গলা চিরে।

কফিন!

একটা কফিনে ওকে আটকে রেখেছে উইলবার!
কতক্ষণ হলো আছে সে এখানে?
কয়েক মিনিট?
কয়েক ঘণ্টা?
কয়েক দিন?
উইলবার তা হলে ওকে খুন করতে চায়?

এখন ধীরে ধীরে মনে পড়ছে। র‍্যাঞ্চে ফেরার পথে ওর বুকে গুলি করেছে ওরই একমাত্র কর্মচারী, উইলবার। অথচ লোকটাকে বিশ্বাস করেছিল ও। বিয়ে করলে আজ উইলবারের বয়সী ছেলে থাকত ওর। সেই উইলবার...

জনের বুকের মাঝে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল একরাশ অভিমান। বয়স হয়েছে, আর ক'দিনই বা বাঁচবে সে? এটুকু ধৈর্য ধরতে পারল না উইলবার! কিছুই গোপন করেনি সে ওর কাছে। উকিলের সামনে উইল করে জানিয়ে দিয়েছিল তার মৃত্যুর পর র‍্যাঞ্চ, রুপোর খনি সবই পাবে উইলবার। এইভাবে স্নেহের প্রতিদান দিল লোকটা!

ভয় সরে গিয়ে মনে স্থান করে নিল প্রচণ্ড রাগ, প্রতিজ্ঞা করল জন, শেষ রক্তবিন্দু থাকতে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করবে না সে।

আরেকটা কাঠি জ্বালল জন। এখন আর হাত কাঁপছে না ওর। চারপাশটা খুঁটিয়ে দেখল। কফিনে জায়গা খুব একটা বেশি নেই। তারমানে ভেতরের অক্সিজেনে বেশিক্ষণ চলবে না। এরইমধ্যে কতখানি খরচ হয়ে গেছে কে জানে। ফুঁ দিয়ে আগুন নেভাল জন। যতরকম ভাবে সম্ভব অক্সিজেন সাশ্রয় করতে হবে।

দু'হাতে কফিনের ডালায় ধাক্কা দিল। বিন্দুমাত্র নড়ল না

ঢাকনি, শুধু ফোমের তৈরি গদিটায় টোল পড়ল।

চাবির গোছা বের করে বড় একটা চাবি বেছে নিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ফোমের গায়ে গর্ত করল জন। ছোট্ট, এক আঙুলের একটা গর্ত হলো। এবার গর্তটা বড় করতে লাগল সে, দু'হাতে কুটি কুটি করে ছিঁড়তে লাগল ফোম। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথার ওপরে অনেকখানি জায়গার ফোম খসিয়ে ফেলল সে। খানিক বিশ্রাম নিয়ে দিয়াশলাই জ্বালল। হলদেটে লাল কাঁপা আলোয় দেখল কফিনের ঢাকনির কাঠ বেরিয়ে পড়েছে, ছেঁড়া তুলোর মত দু'এক টুকরো ফোম শুধু এখনও লেগে রয়েছে কাঠের গায়ে।

তর্জনী বাঁকা করে কাঠে টোকা দিল জন।

ঠক! ঠক! ঠক!

কম দামী পলকা কাঠ!

সস্তা একটা কফিনে ওকে জীবন্ত কবর দিয়েছে উইলবার!

ভয়ঙ্কর একটুকরো নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল জনের ঠোঁটে। টাকা অপচয় করতে চায়নি উইলবার। মাতাল বুড়ো ডাক্তারের কাছ থেকে ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে সবচেয়ে সস্তা কফিনে ওকে পুরেছে লোকটা! ডাক্তার হয়তো ওর লাশ দেখতেও যায়নি, উইলবারের কথা বিশ্বাস করেই ঘাড় থেকে দায়িত্বের বোঝা নামিয়েছে একখানা সার্টিফিকেট লিখে! নিশ্চয়ই দাঁত বের করে হেসেছে উইলবার।

জনও হাসল। সবাইকে দেখে নেবে সে। অন্তত উইলবারের ক্ষমা নেই।

একটা জ্বলন্ত কাঠি ঢাকনির সিকি ইঞ্চির মধ্যে নিয়ে ধরে রাখল জন। ওটা নিভে যেতেই আরেকটা জ্বালল। তারপর আরেকটা। ঢাকনিটা ভাঙতে হলে পুড়িয়ে মুচমুচে করতে হবে কাঠ।

গোটা বারো কাঠি শেষ করার পর হঠাৎই কাঠের ওপর একজায়গায় আগুন ধরল। পোড়া কাঠের সাদা ধোঁয়া নাকে যেতে কেশে উঠল জন। কফিনের অক্সিজেন কমে আসছে। বুক ভরে শ্বাস টানলেও আগের মত ফুসফুস ভরে উঠছে না। জ্ঞান হারাবে বলে মনে হলো ওর। অসাড়, নির্জীব হয়ে আসছে শরীর। গায়ের চামড়ায় একটা তীব্র জ্বলুনী।

ছটফট করে উঠল জন। দু'হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চাইল গায়ের শার্ট। পটাপট ছিঁড়ে গেল কয়েকটা বোতাম। শরীর মোচড়ামুচড়ি করে শার্টটা খুলে ফেলল সে। একটা ফালি ছিঁড়ে জড়িয়ে নিল ডানহাতে। তারপর দমাদম ঘুসি মারতে লাগল ঢাকনির গায়ে।

কাঠের একটা অংশে এখনও আগুন জ্বলছে। অঙ্গারের মত লালচে আবছা আভা ছড়াচ্ছে জায়গাটা। ওই জায়গাটাই জনের লক্ষ্য। কাপড় জড়ানো হাতে ঘুসি মেরে চলল সে।

কতক্ষণ পর ও জানে না, জ্বলন্ত কাঠের কয়েকটা টুকরো খসে পড়ল ওর বুকে। পুড়িয়ে দিল চামড়া। দিশেহারা ব্যস্ত হাতে ওগুলোকে শরীরের ওপর থেকে ঝেড়ে ফেলল সে। যন্ত্রণায় গুড়িয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে আরেকবার শপথ করল। উইলবারের ক্ষমা নেই। দরকার হলে দোজখ পর্যন্ত ধাওয়া করে যাবে সে লোকটাকে।

ঢাকনির গোল একটা অংশে ভালমতই ধরেছে আগুন। ধীরে ধীরে কয়লা হচ্ছে এখন। গনগনে তাপ এসে লাগছে জনের মুখে।

শরীর কুঁকড়ে সরে যেতে চাইল সে। পারল না। কফিনের ভেতরে পর্যাপ্ত জায়গা নেই।

ধোঁয়ায় ভরে গেছে কফিন। দম বন্ধ করা পোড়া কাঠের কটু গন্ধে শ্বাস আটকে আসতে চাইছে।

যক্ষ্মা রোগীর মত একটানা কাশছে জন। অসম্ভব জ্বলছে ওর গলা। কিন্তু থেমে নেই সে, দুর্বল হাতে ঘুসি মারছে এখনও। প্রতি আঘাতে উড়ছে ধুলোর মত মিহি ছাইয়ের কণা, ওর বুকে, মুখে ছিটে এসে পড়ছে গুঁড়ো কয়লার আগুন।

অনেক...অনেকক্ষণ, যেন অনন্তকাল; ঢাকনির গায়ে আঘাত করে চলেছে জন। সময়ের কোনও হিসেব নেই ওর। ঘোরের মধ্যে অতি ধীরে পেরুচ্ছে প্রতিটা দীর্ঘ, প্রলম্বিত মুহূর্ত।

হঠাৎ ঢাকনির পোড়া অংশটা ভেঙে পড়ল জনের গায়ে। টুকরো টুকরো হয়ে গেছে কাঠ। জ্বলছে এখনও।

ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল জন। পাগলের মত মুখে, বুকে, ঘাড়ে চাপড় মেরে টুকরোগুলোকে ফেলতে চাইল। গনগনে অঙ্গার হিসহিস শব্দে পুড়িয়ে দিচ্ছে ওর পা। আগুনের স্পর্শে বড় বড় ফোস্কা পড়ল চামড়ায়।

জবাই করা মুরগির মত ছটফট করতে লাগল জন। গলা চিরে বেরিয়ে এল তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার। তীব্র যন্ত্রণায় বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। কফিনের ভেতর পাগলের মত এপাশ ওপাশ করতে লাগল সে বারবার।

অবশেষে একসময় নির্ভল কয়লার আগুন।

অনেক...অনেকক্ষণ পর সচেতন হলো জন। অন্ধকারে হাতড়ে দিয়াশলাইটা খুঁজে বের করল।

চমকে উঠল একটা কাঠি জ্বেলে।

ঢাকনি যেখানে ফুটো হয়ে গেছে সেজায়গায় দেখা যাচ্ছে গাছের শিকড়ে বুনট দেয়া কালচে রঙের মাটি।

হাত বাড়িয়ে জমাট ভেজা মাটির ঠাণ্ডা আঠাল স্পর্শে শিউরে উঠল জন। হাতটা সরাল না। এই মাটি খুঁড়েই উঠতে হবে ওকে যে করে হোক। থেমে গেলেই মৃত্যু। অক্সিজেন শেষ হয়ে আসছে।

দু'হাতে মাটি খামচাতে লাগল জন। মাঝে মাঝে কাঠি জ্বেলে দেখছে কাজ কতদূর এগোল। প্রতিবারই সরসর করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ওর ঘাড়ের কদমছাঁট চুলগুলো।

অজস্র মাংসাশী কীট আর সাদা-খয়েরী কেঁচো কিলবিল করছে কবরের মাটিতে। যখন তখন খসে পড়ছে কফিনের ভেতরে। ওর গায়ে নড়ছে চড়ছে ওগুলো। অসম্ভব ধীর গতি। জেলির মত আঠাল আর ভেজা।

কেঁপে উঠছে জন, টোকা মেরে শরীর থেকে ফেলে দিচ্ছে ওগুলোকে। ভয়ে ঘৃণায় গোঙাচ্ছে সে, কিন্তু কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। নোঙরা মাটি ঝরে পড়ছে কফিনের ভেতর। ওর চারপাশে ধীরে ধীরে স্তূপের মত উঁচু হয়ে জমছে।

ছোট পাথরে খোঁচা খেয়ে আঙুলের চামড়া ছিলে গেছে ওর। তর্জনীর নখ উল্টে ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে মাংস। বুকের সার্বক্ষণিক ব্যথাটা বেড়ে গিয়ে অসহ্য অত্যাচারে পরিণত হয়েছে। হরিণ শাবকের মত বুকের খাঁচায় লাফ দিচ্ছে হৃৎপিণ্ড। হাঁপাচ্ছে জন। ফুসফুসে বাতাসের বড় অভাব। শ্বাস টানতে গিয়ে ভয় হচ্ছে: বাতাসে অক্সিজেন আছে তো? এখন যদি জ্ঞান হারায়, তা হলে বাঁচবে তো সে?

রক্ত ঝরছে জনের দু'হাত থেকে। ব্যথায় টনটন করছে আঙুলগুলো, যেন যাঁতাকলে চেপে অনেকক্ষণ ধরে পিষছে কেউ ওগুলোকে। প্রতি সেকেন্ডে বাড়ছে শ্বাসকষ্ট, সেই সঙ্গে মরে যাবার ভয়। আতঙ্ক মাথাচাড়া দিচ্ছে মনের গভীর গহন থেকে, মগজ কাজ করতে চাইছে না। আহ্, একমুঠো তাজা বাতাস যদি পাওয়া যেত!

শরীরটাকে ভাঁজ করে বুকের কাছে দু'হাঁটু নিয়ে এল জন। ঢাকনির গায়ে হাঁটু দিয়ে গায়ের জোরে ঠেলা দিল। মাটি খুঁড়ছে

দু'হাতে। আপন মনে বিড়বিড় করছে, 'একটু! আর একটু! প্রতিশোধ! প্রতিশোধ নিতে হবে তোকে, জন! খবরদার, জন! হাল ছাড়বি না!'

ওর চারপাশে মাটির স্তূপ জমে কফিনের ঢাকনি প্রায় ছুঁই ছুঁই করছে। নোংরা, আঠাল মাটি চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলছে ওকে। ফুসফুস দুটো যেন ফেটে যাবে বেশি ফোলানো বেলুনের মত! না, বাঁচতে হবে ওকে, শ্বাস নিতে হবে।

শেষবার কখন দম নিয়েছে ভাবতে চেষ্টা করল জন। মনে পড়ল না। বুক ভরে দম নিল। কিন্তু অক্সিজেন অতি কম। ফুসফুসের চাহিদা মিটল না। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসছে শরীর। মনটা চলে যাচ্ছে অনেক দূরে কোথাও। ব্যথার বোধ ভোঁতা হয়ে গেছে। কৃতজ্ঞ বোধ করল জন। অদ্ভুত একটা প্রশান্তি ভরা ঝিমানি ঘিরে ধরছে ওকে গভীর ঘুমের মত।

এটাই কি তবে মৃত্যু?

এখানেই সব শেষ?

উইলবারের চেহারা মনে পড়তেই দাঁতে দাঁত চাপল জন। না, উইলবার বেঁচে থাকতে সে মরতে পারে না। প্রতিশোধ নিতে হবে। ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ!

হাত চালাল জন। উপড়ে যাওয়া নখের ব্যথায় আঙুলগুলো দপ দপ করছে। নুড়ি পাথরে ঘষা খেয়ে জায়গায় জায়গায় উঠে গেছে চামড়া আর মাংস। তীব্র ব্যথা। দম নেই। শ্বাস নিতে হাঁ করল জন। মুখে মাটি ঢুকে গেল। জিভ ঢেকে দিয়ে জমা হলো গলার কাছে, আলজিভের গোড়ায়। লালায় মিশে চটচটে কাদা হয়ে যাচ্ছে পোকামাকড় ভরা ভিজে মাটি। মুখের ভেতরে নড়ছে কীটের দল। দম আটকে যাওয়ায় বমি পেল ওর। হড়হড় করে বমি করল। গুলাচ্ছে গা, যেন উত্তাল বিক্ষুব্ধ সাগরে ছোট্ট একটা

নৌকায় আছে সে।

একদলা মাটি গলায় ঢুকে আটকে গেল।

ক্ষোভে, হতাশায় ফুঁপিয়ে উঠল জন। হেরে যাচ্ছে... হেরে যাচ্ছে সে। জীবন কেড়ে নিতে ছুটে আসছে হিমশীতল ভয়াল মৃত্যু!

শেষ চেষ্টা হিসেবে প্রাণপণে মাটি খুঁড়ল। হঠাৎ টের পেল, মাটি ভেদ করে ওপরে উঠেছে একটা তর্জনী। রক্ত ভেজা আঙুলে বাতাসের ঠাণ্ডা একটা স্পর্শ। অনুভূতিটা ওকে পাগল করে তুলল।

আশা আছে! সব শেষ হয়ে যায়নি!

সমস্ত মনোযোগ একত্র করে খুঁড়তে লাগল সে। একটু একটু করে বড় হচ্ছে গর্তটা। তাজা বাতাস ঢুকছে কফিনে। শিশিরে-ভেজা-ঘাসের মিষ্টি গন্ধে ভরা সতেজ বাতাস। উদ্যম ফিরে পেল জন। খানিক পরই মাটির ওপর হাত দুটো বের করতে পারল সে। শরীরে পিচ্ছিল কাদা লেগে থাকায় ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল।

বেরতে সুবিধা হবে।

চেষ্টা করে দেখল। আটকে গেল কাঁধ।

না, হয়নি, আরও বড় করতে হবে গর্তটা।

আবার কাজ শুরু করল জন। মাথাটা স্থির হয়েছে ওর। ধীরেসুস্থে মাটি খুঁড়ছে।

মিনিট দুয়েক পর গর্তটা যথেষ্ট প্রশস্ত হলো। কফিন থেকে শরীর মুচড়ে বেরিয়ে এল জন। হাসছে সে। হাসির দমকে কাঁপছে সারা শরীর। তবে দু'চোখ জ্বলছে তীব্র বিদ্বেষে। হ্যাঁ, এবার সময় এসেছে, খারাবি আছে উইলবারের কপালে।

একটু সুস্থির হয়ে চারপাশে তাকাল জন। কবরের এপিটাফে লেখাঃ জন র‍্যাচেল। অপঘাতে মৃত্যু। জানুয়ারি, এক। সিডার স্প্রিঙসের বুটহিলে আছে সে। তারমানে অপঘাতে মৃত্যুর

সার্টিফিকেট লিখেছে ডাক্তার। উইলবার কী বুঝিয়েছে ডাক্তারকে? আততায়ীর হাতে জন র‍্যাচেল নিহত হয়েছে?

কাঁধ ঝাঁকাল জন। কিছু যায় আসে না। একবার র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে পারলে হয়, কোনওদিন আর কাউকে কিছু বলার সুযোগ হবে না উইলবারের। আর মিথ্যে বোঝাবে না কাউকে। ক্ষতি করতে পারবে না কারও।

র‍্যাঞ্চটা মাইলখানেক দূরে। পা বাড়াল জন। ঘুমন্ত সিডার স্প্রিঙস পার হওয়ার সময় ধন্যবাদ দিল ভাগ্যকে।

এখন গভীর রাত না হয়ে দিন হলে হুলস্থূল পড়ে যেত গোটা শহরে। খবরটা কানে গেলেই পালাত উইলবার।

নিজের বিছানার কথা মনে পড়ল জনের। এখন নিশ্চয়ই হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে তার খাটে ঘুমাচ্ছে উইলবার।

'আমি আসছি,' মনে মনে বলল জন, 'ঘুমিয়ে নাও, এই ঘুম তোমার শেষ ঘুম উইলবার!'

কীভাবে উইলবারকে খুন করবে ভেবে রেখেছে জন। লোকটা ওর অর্ধেক আকারের। প্রথমে উইলবারের হাত-পা বাঁধবে সে। তারপর মুখে রুমাল গুঁজে দুধের বাচ্চার মত নাক টিপে মারবে। উপভোগ করবে প্রতিটা মুহূর্ত। কাছ থেকে তারিয়ে তারিয়ে দেখবে শ্বাসকষ্টে কেমন ছটফট করে উইলবার। বেজন্মাটা এভাবেই ওকে মারতে চেয়েছিল, না হলে জীবিত অবস্থায় কফিনে পুরে দিত না।

হাঁটার গতি দ্রুত হলো জনের।

পুব আকাশ ফরসা হয়ে আসছে। ডেকে উঠে চুপ হয়ে যাচ্ছে দু'একটা কাক। তারাগুলো একেবারেই ঝাপসা। উইলবার ঘুম থেকে ওঠার আগেই পৌঁছতে হবে ওকে। কোনও ঝুঁকি নেয়া চলবে না। মনে রাখতে হবে সে নিজে অসুস্থ, আহত এবং দুর্বল।

পুবের নীলচে পাহাড়গুলোর ওপরের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে, দিকচক্রবালে মুখ তুলেছে সূর্য, এমন সময় র‍্যাঞ্চে পৌঁছে গেল জন।

র‍্যাঞ্চহাউজের গেট হাঁ করে খুলে রেখেছে উইলবার। নিশ্চিন্তে উঠানে পা রাখল জন। কেউ দেখে ফেলবে সে-ভয় নেই। ছোট্ট র‍্যাঞ্চ। উইলবার ছাড়া আর কোনও কর্মচারী রাখার কোনও প্রয়োজন বোধ করেনি কখনও সে।

কয়েক কদম এগিয়েই থমকে দাঁড়াল জন। ভ্রূ কুঁচকে গেল।

উঠানে একটা নতুন কবর!

কবর এল কোত্থেকে!

এখানে কোনও কবর তো ছিল না!

কার কবর?

কবরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল জন। ভোরের আলো অনেকটা উজ্জ্বল হয়েছে। সেই আলোয় ঝুঁকে পড়ে চারকোনা এপিটাফটা দেখল। ওকে লেখা:

উইলবার স্মিথ, ফোরম্যান,

র‍্যাঞ্চার জন র‍্যাচেলকে হত্যার অপরাধে

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

জুন মাস, এক তারিখ।

অপরাধ স্বীকার করেছিল উইলবার? অনুশোচনা? পাপ বোধ আর সহ্য করতে পারেনি? কী ঘটেছিল জানার কোনও উপায় আপাতত নেই। শহরে গিয়ে জানতে হবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জন। আবার এপিটাফে মন দিল। তারিখটা চোখে পড়তেই চমকে উঠল সে। অবিশ্বাসে থরথর করে কাঁপতে লাগল সারা শরীর।

জুন মাসের এক তারিখ? তা কী করে হয়?

স্পষ্ট মনে আছে ওর, জানুয়ারির এক তারিখে বিকেলবেলা ওকে গুলি করেছে উইলবার!

আজ কত তারিখ?

কবরের মাটির দিকে তাকাল জন। মাটি এখনও চেপে বসেনি। তারমানে কবরটা অল্পদিন আগে খোঁড়া হয়েছে। বেশিদিন হয়নি মরেছে উইলবার।

দপদপ করছে জনের মাথা। মগজটা ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। তারিখটায় কোনও ভুল নেই তো? আবার এপিটাফে চোখ বুলাল সে।

জুন মাস, এক তারিখ!

তা হলে?

নিজের কবরের এপিটাফে দেখেছে জন, জানুয়ারির এক তারিখেই ওকে কবর দেয়া হয়েছে।

পাগলের মত মাথা ঝাঁকাল জন। ভয়ঙ্কর একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে ওর মনে। কী যেন মনে থাকার কথা... কী যেন মনে হবে... অথচ কিছুতেই মনে পড়ছে না!

পাহাড়ের মাথায় উঁকি দিয়েছে রক্তভরা পাকা টুসটুসে আঙুরের মত সূর্যটা।

ধীর পায়ে চৌবাচ্চার সামনে গিয়ে দাঁড়াল জন। স্থির পানি আয়নার মতই প্রতিফলিত করল ওর চেহারা। নিজেকে স্পষ্ট দেখতে পেল জন।

এই জনকে সে চেনে না। বিকৃত একটা আধপচা লাশ তাকিয়ে আছে ওর চোখের শূন্য কোটরের দিকে। মুখ থেকে গলে খসে পড়েছে মাংস। পোকা কিলবিল করছে। নাকের নরম হাড্ডি কুরেকুরে খাচ্ছে ওগুলো। মাড়িহীন দাঁত ভেঙচি কাটছে।

ছয় মাসের পচা গলা বিকৃত একটা লাশ সে!

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জন। বুঝতে পেরেছে সবই।

'চলে এসো, যা জানতে চেয়েছিলে জানতে পেরেছ, তোমার কাজ পৃথিবীতে শেষ হয়েছে,' দূর, বহু দূর থেকে ভরাট মিষ্টি গলায় কে যেন ডাকছে ওকে।

ঘুরে দাঁড়াল জন। শহরটাকে এড়িয়ে ছুটতে ছুটতে বুটহিলে এল। শুয়ে পড়ল নিজের কবরে। এক সময় অনেক নীচে দেখতে পেল নীল রঙের গোল পৃথিবীটাকে। ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যাচ্ছে সেই পৃথিবী।

[বিদেশী গল্পের ছায়া অনুসরণে]

কাজী মায়মুর হোসেন

অশরীরী

ভূত-প্রেতে কোনকালেই বিশ্বাস ছিল না আমার। কিন্তু বন্ধু নাজমুলের এসব ব্যাপারে দারুণ আগ্রহ, জিন, ভূত কিংবা অশরীরী যে সত্যি সত্যিই আছে, তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে সে। এক বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় আমার ড্রইংরুমে জমিয়ে আড্ডা হচ্ছিল। আমি, নাজমুল, শাকীল আর সুজন। সুজনের ব্যাপারে সম্ভবত এর আগে কখনও বলা হয়নি। বি.এ. পাস করে বাবার ফার্নিচারের ব্যবসা দেখাশোনা করছে– আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নাজমুল আর শাকীলকে বোধহয় নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কিছু নেই।

আড্ডার এক পর্যায়ে ভূত-প্রেতের কথা উঠল। নাজমুল বলল, 'ভূত, প্রেত কিংবা অশরীরী কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা, তা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের আর কোন সুযোগ নেই। কারণ খোদ আমেরিকাতেই "অ্যামিটিভিলের ভৌতিক বাড়ির" ব্যাপারটা ইদানীং অবিশ্বাসীদের কাছেও স্বীকৃতি পেয়েছে।'

'তবে আমাদের চারপাশে যে সমস্ত সত্যিকারের (!) ভূত-প্রেতের কাহিনি প্রচলিত আছে সেগুলোর প্রায় সবটাই ভুয়া,' বললাম আমি।

'কী, কী, ভুয়া কাহিনি প্রচলিত আছে, দু'একটা উদাহরণ দে তো দেখি?' নাজমুলের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

'ধর্, এক পূর্ণিমার রাতে তুই গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে চলেছিস্। পথে আর কোন লোকজন নেই। এমন সময় দেখা গেল, একটা ছায়ামূর্তি তোর পেছন পেছন হাঁটছে। তুই হাঁটছিস, সেও হাঁটছে, তুই দৌড়াচ্ছিস, সেও দৌড়াচ্ছে। আসলে ওটা কিন্তু তোরই ছায়া। এ ছাড়া এমনও কাহিনি শোনা গেছে, সন্ধ্যার সময় কোন এক রাখাল গরুর পাল নিয়ে মাঠ থেকে ফিরে আসার সময় ভূতের খপ্পরে পড়ে কিছুতেই আর সামনে এগোতে পারছে না। ভয়ে প্রায় মূর্ছা যাবার উপক্রম তার। তার চেঁচামেচিতে লোকজন কাছে এসে দেখে, গরু বেঁধে রাখার খুঁটির সঙ্গে তার লুঙ্গিটা পেঁচিয়ে যাওয়াতেই এই অঘটন ঘটেছে।'

আমার কথা শেষ না হতেই নাজমুল বলল, 'আসলে তোর এই দুটো কাহিনিই এত প্রাচীন যে নব্য অবিশ্বাসীরাও "ভূত নেই" প্রমাণ করতে গিয়ে এই বস্তাপচা গল্পের অবতারণা করবে না।'

'ভূত-প্রেতের ব্যাপারটায় সত্যি-মিথ্যা কতটুকু আছে জানি না,' অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর এবারে মুখ খুলল সুজন, 'কিন্তু নিতাই বলে, প্রতিদিন রাতে ওর মিষ্টির দোকান বন্ধের কিছুক্ষণ আগে আচমকা কিছু লোক এসে হাজির হয়। লোকগুলো ছয় ফুট কিংবা তারও বেশি লম্বা। ওরা দোকানে ঢুকেই একগাদা মিষ্টির অর্ডার দেয়। অপ্রয়োজনীয় একটা কথাও বলে না। মিষ্টি কেনা হয়ে গেলে দাম চুকিয়ে দিয়েই যেন বাতাসে মিলিয়ে যায়– এতই দ্রুত এদের চলাফেরা! নিতাই বলে, 'এরা নাকি জিন, আসে মানুষের ছদ্মবেশ ধরে। মিষ্টি খুব পছন্দ করে এরা। সাধারণত শনি আর মঙ্গলবারেই বেশি আনাগোনা লক্ষ করা যায় এদের।'

সুজনের ছেলেবেলার বন্ধু নিতাইয়ের সঙ্গে আমাদের সবারই

কম-বেশি বন্ধুত্ব আছে। শান্তিনগরের মোড়েই ওর মিষ্টির দোকান– দোকানের নাম 'মিষ্টি মুখ'।

'শোন, সুজন,' শাকীল বলে উঠল এবার, 'লোক মুখে শুনেছি, জিনেরা নাকি অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারী। যদি তাই হবে তা হলে এই রাত বিরেতে মানুষের দোকানে এসে মিষ্টি কেনা কেন! নিজেরাই তো ইচ্ছে করলে হাজারো রকমের মিষ্টি তৈরি করে নিতে পারে!'

সুজনের কণ্ঠে এবারে খানিকটা ক্ষোভ প্রকাশ পেল যেন। 'এসব ঘটনার সত্যি-মিথ্যা জানি না। কিন্তু নিতাইকে তো তোরা সবাই ভাল করে চিনিস। বাজে কথা বলার ছেলে ও নয়। আর যদি চাস তো একদিন রাতের বেলায় ওর দোকানে চল। ঘটনার সত্যি-মিথ্যা নিজেরাই যাচাই করে দেখার সুযোগ পাবি।'

ভূত-প্রেতে বিশ্বাস আছে নাজমুলের। সুতরাং নিতাইয়ের দোকানে জিনদের আনাগোনার ব্যাপারটা এককথায় মেনে নিল সে। শাকীলকে বললাম, নিতাইয়ের দোকানে গিয়ে ব্যাপারটা হাতে-কলমে পরখ করবে কিনা। কিন্তু ও এক কথায় প্রস্তাব নাকচ করে দিল– অত বাজে সময় নাকি ওর নেই। শেষ পর্যন্ত কাজটা আমার ঘাড়েই চাপল। বললাম, 'ঠিক আছে, সুজন। তুই নিতাইয়ের সঙ্গে কথা বলে একটা দিন ঠিক কর, আর কেউ না গেলেও জিনদের সঙ্গে মোলাকাত করতে আমিই যাব ওর দোকানে।'

কয়েকদিন পর সুজনের দেখা পাওয়া গেল। ও নিতাইয়ের সঙ্গে আলাপ করে এসেছে। আগামী মঙ্গলবার আমাকে দোকানে যেতে বলেছে নিতাই। আজ রবিবার, অর্থাৎ আজ থেকে দু'দিন পরই জিন-রহস্যের আসল ঘটনা উদ্ঘাটিত হবে! যদিও এসব ব্যাপারে

আমার অবস্থান অবিশ্বাসীদের দলেই, তবু মনের মাঝে শিরশিরে একটা অনুভূতির উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করতে পারলাম। সুজনকে বললাম, ওই দিন আমার সঙ্গে থাকার জন্য। কিন্তু ও ব্যবসার কাজে ঢাকার বাইরে যাবে সুতরাং জিনদের সঙ্গে মোলাকাতের ব্যাপারটা আমাকে একলাই সামলাতে হবে!

মঙ্গলবার রাত সাড়ে দশটার দিকে পৌঁছে গেলাম নিতাইয়ের দোকানে। ক্যাশ-কাউন্টারে একটার বদলে দুটো চেয়ার। বুঝলাম, ওর পাশেই বসার জায়গা ঠিক করা হয়েছে আমার জন্য। এতে বরং সুবিধেই হবে– অনেকেই হয়তো ভাববে, আমি বোধহয় মালিক পক্ষের কেউ, ক্যাশিয়ারকে চোখে চোখে রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা। কথাটা নিতাইকে বলতেই ও তো হেসেই খুন।

ঘড়ি দেখলাম। এগারোটা বাজতে মিনিট দশেক বাকি। এরই মাঝে তিনজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা বেশ কিছু মিষ্টি কিনে নিয়ে গেল। তবে উচ্চতায় এদের কেউই চোখে পড়ার মত নয়– তাই এদেরকে নিয়ে মোটেই মাথা ঘামালাম না। এরকম টুকটাক বেচা-বিক্রি চলতে লাগল আরও কিছুক্ষণ, এবং সোয়া এগারোটার পর দোকানে খদ্দের আসা বন্ধই হয়ে গেল একরকম। সাড়ে এগারোটার সামান্য আগে বেশ জোরে গাড়ি ব্রেক কষার আওয়াজ পাওয়া গেল। বাইরে তাকালাম। অল্পবয়সী স্বামী-স্ত্রী নেমে এল গাড়ি থেকে। মেয়েটির বয়স বড়জোর বিশ আর ছেলেটি পঁচিশের বেশি হবে না। তবে লক্ষ করার মত ব্যাপার হচ্ছে, ছেলেটি লম্বায় ছ'ফুটের চেয়েও বেশি! ছেলেমানুষি কৌতূহল মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। চেয়ার থেকে উঠে শো-কেসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছেলেটির একেবারে গায়ে ঘেঁসে একটা সিগারেট জ্বালালাম। ইচ্ছে করেই লাইটারের শিখা বাড়ালাম, কমালাম বেশ কয়েকবার। কিন্তু

ছেলেটির মাঝে কোন ভাবান্তর লক্ষ করলাম না– ওদিকে আমার কাণ্ড দেখে মুখ টিপে টিপে হাসছে নিতাই। যাহোক, ওরা কিছু মিষ্টি কিনে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

এখন রাত এগারোটা পঁয়ত্রিশ। ভেতরে ভেতরে অধৈর্য হয়ে উঠেছি। নিতাইকে বললাম, 'আজ বোধহয় কপাল মন্দ আমাদের। "তেনাদের" পদধূলি পড়বে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'আমাদের আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে,' বলল নিতাই, 'সাধারণত শনি ও মঙ্গলবারে তারা আসবেই।'

খুব বেশিক্ষণ আর প্রতীক্ষায় থাকতে হলো না। ঘড়িতে রাত পৌনে বারোটা বাজার একটু পরেই হঠাৎ কোত্থেকে যেন বেঁশ কজন লোক এসে হাজির। লম্বায় এদের কেউই ছ'ফুটের কম হবে না। পরনে আলখেল্লা এবং সবার মুখেই চাপ দাড়ি। সংখ্যায় এরা মোট ছ'জন। লোকগুলো দোকানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চোখ টিপল নিতাই– অর্থাৎ মেহমানরা এসেছেন! লোকগুলো দোকানে ঢুকেই অন্য কোন কথা না বলে ইশারায় বেয়ারাদের ডেকে মিষ্টির পরিমাণ বলে যেতে লাগল। লক্ষ করলাম, দোকানের বেয়ারারাও এদের আচরণের সঙ্গে বেশ অভ্যস্ত। তারা কোন কথা না বলে মিষ্টি বাক্সে ভরতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে গেল; অবশ্য পনেরো-বিশ সেকেন্ড পরেই আবার জ্বলে উঠল বাতি। ভেতর থেকে কে যেন ইমার্জেন্সী ল্যাম্প এনেছিল, সেটা আর জ্বালানোর প্রয়োজন পড়ল না। এদিকে বেয়ারারা মিষ্টির প্যাকেটগুলো বেঁধে পলিথিনের ব্যাগে ঢোকাচ্ছে। কারেন্ট চলে যাবার পর থেকে এ পর্যন্ত মাত্র মিনিট খানেক পেরিয়েছে। অথচ আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, এই সামান্য সময়টুকুর মধ্যে পুরো দোকানটায় কিছু একটা ঘটে গেছে। কিন্তু কী ঘটেছে, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। যাক। লোকগুলো কাউন্টারে বিল মেটাতে

এলে আমি আগের কৌশল প্রয়োগ করলাম। লাইটারের শিখা দেখে সামনের লোকটি একটু যেন থমকে দাঁড়াল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। লোকগুলো আর দেরি করল না। কিছু ভাঙতি টাকা ফেরত নিয়ে চোখের পলকে মিষ্টির প্যাকেটসহ দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। আমি উঠে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ালাম। ওরা রাস্তা দিয়ে এত দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিল যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। কোন মানুষের পক্ষে এভাবে হাঁটা প্রায় অসম্ভব। আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করে কেমন যেন খটকা লাগল। ওরা দোকানে ঢুকেছিল মোট ছ'জন, কিন্তু বেরিয়ে যাবার সময় লক্ষ করলাম সংখ্যায় ওরা পাঁচ জন। তা হলে আরেকজন গেল কোথায়! নাকি কারেন্ট চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়েছে! ব্যাপারটা নিতাইকে বললাম। ও মুখে কিছু না বলে শুধু বিজ্ঞের মত হাসল। এদিকে ঘড়ির কাঁটা সোয়া বারোটা ছুঁই ছুঁই করছে। নিতাই আমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চাইল। আমি আপত্তি করলাম না– যদিও ওর দোকান থেকে আমার বাড়ি রিকশায় বড়জোর তিন মিনিটের রাস্তা, তবু এত রাতে একা একা বাড়ি ফেরা উচিত হবে না। ঠিক হলো, ও রিকশা করে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আবার দোকানেই ফিরে যাবে। আজ রাতে দোকানেই থেকে যাবে ও।

রাস্তায় বেরিয়ে চট্ করেই পেয়ে গেলাম রিকশা। দামাদামি না করে উঠে পড়লাম দু'জনে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়ির গেটে এসে থামল রিকশা। রিকশা থেকে নেমে নিতাইকে বিদায় দেব বলে পেছন ফিরে তাকিয়েছি, কিন্তু এ কী! সীটে তো ও নেই! অন্ধকারেই চারদিকে দৃষ্টি বুলাচ্ছি– কিন্তু নাহ্, যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে নিতাই। সংবিৎ ফিরে পেলাম রিকশাওয়ালার ডাকে, 'সাব, এই আন্ধারে কী খুঁজতাছেন?'

বললাম, 'যে লোকটি রিকশায় আমার সঙ্গে এল, তাকে কি তুমি নামতে দেখেছ?'

অবাক দৃষ্টিতে লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, 'হেই মিষ্টির দোকান থিকা আফনে তো একাই আইলেন আমার রিকশায়, অহন আবার লোক পাইলেন কোনহান থিকা?'

রিকশাওয়ালার সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে ভাড়া দিয়ে বিদায় করলাম। বাড়িতে ঢুকেই ফোন করলাম নাজমুল আর শাকীলকে। পুরো ঘটনা খুলে বললাম ওদের। শাকীল বলল, 'নাজমুলকে নিয়ে আমি এখনই তোর ওখানে আসছি। কে জানে নিতাইয়ের ভাগ্যে কী ঘটেছে!'

দশ মিনিট পর গাড়ি নিয়ে শাকীল এসে হাজির। সঙ্গে নাজমুলও এসেছে। দেরি না করে আমরা নিতাইয়ের দোকানের উদ্দেশে রওনা হলাম। ওখানে পৌঁছে দেখি হুলস্থুল কাণ্ড! কয়েকজন কর্মচারী নিতাইকে চৌকিতে শুইয়ে মাথায় পানি ঢালছে। ওদের কাছ থেকে জানা গেল, দোকানের সাথে লাগোয়া বাথরুমটা অনেকক্ষণ যাবৎ ভেতর থেকে বন্ধ দেখতে পেয়ে একজন কর্মচারী সবাইকে ডেকে নিয়ে আসে এবং দরজা ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দরজা ভেঙে ওরা দেখতে পায় বাথরুমের মেঝেতে অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে নিতাই। এদিকে মাথায় পানি ঢালার পর জ্ঞান ফিরে এসেছে ওর। ও বলল, হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়ার পর একটা মিষ্টি সুগন্ধ নাকে এসে লাগে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। নাজমুল আমার অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে জিন-ভূতের অস্তিত্বের ব্যাপারে আরও জোরেশোরে

প্রচারে নেমেছে। শাকীলের দৃষ্টি-ভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটেছে। ওই ঘটনার পর থেকে ও আর কখনোই এ ব্যাপারে কোনরকম উচ্চবাচ্য করে না। আর আমার মনোভাবের কথা জানতে চাইছেন? যে ঘটনা সেদিন আমি চাক্ষুস করেছি, তারপর এ ব্যাপারে বেশি কিছু বলার আছে কি? ইচ্ছে করলে আপনারা আমার মত অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে পারেন। নিতাইকে গিয়ে আমার কথা বললেই ও সব ব্যবস্থা করে দেবে। দোকানটা শান্তি নগর মোড় থেকে সামান্য দক্ষিণে, নাম– 'মিষ্টি মুখ'।

কাজী সারওয়ার হোসেন

আগুন-বাবা

মেচি নদীর বেশ খানিকটা দক্ষিণ থেকে শুরু হয়েছে নেপাল তরাইয়ের আদিম বন। দুর্ভেদ্য এই বন উত্তর আর দক্ষিণে অনেক মাইল এগোবার পর হঠাৎ করেই শেষ হয়েছে কুসি নদীর প্রান্তে। এখানকার মত বিচিত্র জাতের বড় বড় শিকার ভারতের আর কোনও বনেই নেই।

পথের মাঝে রাত নেমে আসায় আমি একবার এখানে রাত কাটাতে বাধ্য হয়েছিলাম গাছের ডালে বসে। সান্ত্বনা বলতে সঙ্গে ছিল অনভিজ্ঞ এক বাচাল শিকারী চৌকিদার আর প্রচুর পরিমাণে ধূমপানের ব্যবস্থা। মাংসাশী প্রাণীর আওতার বাইরে থাকলেও আমরা ছিলাম ক্ষুধার্ত মশার পুরো আওতায়। ধূমপান, চড়, গালাগালি এসব অস্ত্র তাদের বিপক্ষে কোনও কাজেই লাগল না। ফলে তাদের কামড়ে হাতে-মুখে জ্বালা ধরে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই, পাশাপাশি চৌকিদার বকর বকর করে শোনাল ম্যালেরিয়ায় ভয়াবহ মৃত্যুর পূর্বাভাস।

আমার চেহারা কেমন হলো তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে প্রথম উষার আলোয় চৌকিদারের ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়া মুখ দেখে তার কিছুটা আন্দাজ পেলাম। মনে মনে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম যে আমার চেহারা বদলে গেলেও নিশ্চয়

চৌকিদারের মত অতটা বদলে যায়নি, তারপর অপেক্ষায় রইলাম সকালের। আলো পুরোপুরি ফোটার পর এত বিচিত্র প্রজাতির প্রাণীর আনাগোনা দেখলাম যে মশার কামড়ের জ্বলুনির কথা আর মনে রইল না।

চতুষ্পদ কোনও প্রাণীই বাদ গেল না বোধহয়। এল তারা একাকী, এল জোড় বেঁধে, এল দলে দলে। সব শেষে এল শুয়োর, হরিণ, খরগোশ আর সজারুর মত ছোট ছোট সব শিকার।

'এমন দৃশ্য জীবনে দেখিনি, হুজুর,' বলল চৌকিদার।

'আর কখনও দেখবেও না, যদি না আবার মশার খোরাক হতে রাজি হও,' জবাব দিলাম আমি।

তারপর চৌকিদার মশার চোদ্দগোষ্ঠির যে-বর্ণনা শুরু করল, তা এখন না বলাই ভাল। ঘণ্টাখানেকের কিছু বেশি সময় ধরে চলল প্রাণীগুলোর আনাগোনা। সর্বশেষ প্রাণীটাও ঝোপের আড়ালে হারিয়ে যেতে পুবাকাশে ঝকমকিয়ে হেসে উঠল সূর্য।

নীরবে গাছ থেকে নেমে আমি ধরলাম বাংলোর পথ, খাণ্ডারনি বৌয়ের কথা ভাবতে ভাবতে চৌকিদার চলল তার বাড়ির দিকে। এগোতে এগোতে বৌয়ের হাতে দুর্দশার এমন সব কথা বলতে লাগল সে, মাঝেসাঝে হাসি চাপতে রীতিমত কসরত করতে হলো আমার।

তিন দিন পর আমার এক বন্ধু এল কয়েকটা দিন থাকার জন্যে। এই গল্প সেই গল্পের পর সেই জায়গাটার অসংখ্য জাতের জীব-জানোয়ারের কথা বলতেই তার চোখ উত্তেজনায় চকচক করে উঠল।

ওখানে আবার যেতে সরাসরি অস্বীকার করে আমি বললাম, 'চৌকিদারকে ভজাতে পারো কী না দেখো। আর যেহেতু

একটামাত্র বনমুরগি মারার পারমিট নিয়ে এসেছ, তার বেশি কিছু মারার চেষ্টা কোরো না। এখানে পারমিট ছাড়া শিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।'

'আজ বিকেলেই কথা বলব চৌকিদারের সঙ্গে, প্রয়োজনে তাকে ঘুস দেব,' জবাব দিল বন্ধুটি।

'তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি,' বললাম আমি। 'টাকায় কাজ হতে পারে।'

বিকেলে চৌকিদার এল। বন্ধুটি প্রথমে তাকে অনুরোধ করল, তারপর মিষ্টি মিষ্টি কথা বলল, তারপর ধমকাল, সবশেষে ঘুস দিতে চাইল। কিন্তু কোনও লাভ হলো না। আমার দিকে ঘুরে চৌকিদার বলল, 'মশার ভয় আমার নেই, হুজুর, আমি যাব না আগুন-বাবার জন্যে।'

'আগুন-বাবা, তার কথা তো কখনও শুনিনি।'

'আমিও শুনিনি, হুজুর। কিন্তু আমার বৌ ওখানে আমাদের রাত কাটাবার কথা শুনে বলল যে আমার অনেক সৌভাগ্য, আগুন-বাবা আমাকে খতম করে ফেলেনি। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। তারপর যখন সব খুলে বলতে বললাম, সে আমাকে পাঠাল ধনবীর সর্দারের কাছে।'

'ধনবীরকে তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে?'

'করেছি, হুজুর। ওই মাগীর আবোল-তাবোল কথায় অস্থির হয়ে রইলাম সারাটা দিন, তারপর গতকাল সন্ধ্যেয় ধনবীরের সঙ্গে দেখা করে, তাকে ডেকে নিয়ে গেলাম একপাশে।'

'সে কী বলল?'

'যা বলল তা বলার মত নয়, হুজুর, আপনি আর আমি মানবজাতির এক শত্রুর হাত থেকে বেঁচে গেছি।'

'বলার মত না হলেও কথাগুলো আমরা শুনতে চাই। কোনও

দুর্ঘটনা ঘটলে আমরা তার দায়িত্ব নিতে রাজি আছি।'

'হুজুর, সে বলল যে সেরাতে আমরা যেখানে বসেছিলাম, তার শতখানেক গজের মধ্যেই প্রত্যেক রাতে ঘটে এক ভীষণ রহস্যময় ঘটনা। সেরাতে মশার আক্রমণে আমরা চারপাশে তাকাবার সুযোগ পাইনি। তবে সুযোগ না পেয়ে ভালই হয়েছে, হুজুর। খুব কম মানুষই আগুন-বাবার সাক্ষাৎ পায়, আর যারা পায়, তারা খুব শিগ্‌গিরই হয় কোনও না কোনও দুর্ভাগ্যের শিকার। দিনের বেলা সে একজন যোগী হয়ে থাকে, আর রাতে রূপান্তরিত হয় আগুনে।'

'যত্তসব বাজে কথা!' বলল আমার বন্ধু। 'শোনো, তুমি কি এমন কারও সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারো, যে ওই অদ্ভুত মানুষটাকে আমাদের দেখাতে পারবে? আমরা কেবল তাকে এক নজর দেখতে চাই, তারপর যা খোঁজ নেয়ার আমরা নিজেরাই নেব। এই কাজের জন্যে আমি তাকে পাঁচ টাকা দিতে রাজি আছি।'

পরদিন এক থারুকে এনে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল চৌকিদার। থারু হলো নেপালের তরাইয়ের অধিবাসী। এই অঞ্চলে বসবাসের কারণে তারা তরাইয়ের প্রাণঘাতী জ্বর থেকে নিরাপদ। আজব ব্যাপার হলো, তরাই থেকে অন্য অঞ্চলে সরিয়ে নিয়ে গেলে তারা জ্বরে আক্রান্ত হয়। একমাত্র সময়ই তাদের এই রোগ সারায়। ভারত জুড়ে এই থারুরা মাহুতের কাজ করে।

'এই লোক পাঁচ টাকার বিনিময়ে আপনাদের আগুন-বাবাকে দেখাতে রাজি,' বলল চৌকিদার।

আমার বন্ধুটি তো পারলে তখনই বেরিয়ে পড়ে। তাকে থামিয়ে বললাম, 'আগে এই লোকটাকে কিছু প্রশ্ন করি. জবাব

সন্তোষজনক হলে তাকে আমরা কাজ দেব। আর না হলে, আগুন-বাবা আরও কয়েক দিন অপেক্ষা করুক।'

থারুর দিকে ফিরে জানতে চাইলাম, আগুন-বাবাকে সে কখনও দেখেছে কী না। 'তাকে তো প্রায়ই দেখি,' চটপট জবাব দিল থারু। 'অনেক বছর ধরে বাবা এখানে আছে। এক হাতি তার শত্রু, জানোয়ারটাকে বন্ধুতে রূপান্তরিত না করা পর্যন্ত সে এখানেই থাকতে চায়।'

'তোমার কথা আমাদের বিশ্বাস হয়েছে,' মন্তব্য করলাম আমি। 'তুমি চাইলে এখন আমরা রওনা দিতে পারি।'

চুপি চুপি রিভলভার নিয়ে আমরা চললাম থারুর পিছু পিছু। যে বনে কেটেছিল আমরা আর চৌকিদারের দুর্দশার রাত, সেখানেই আমাদের দু'জনকে নিয়ে গেল থারু। পথ দেখিয়ে দু'শো গজ এগোবার পর, হঠাৎ ডানে ঘুরেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল একটা ঝোপের ভেতরে। তাকে অনুসরণ করে আমরা পৌঁছুলাম ঝোপের মাঝের একটা খোলা জায়গায়। সেখানে একটা বাঘের চামড়ার ওপর বসে গভীর ধ্যানে মগ্ন একজন যোগী। সম্পূর্ণ নগ্ন, ছাই-মাখা কৃশ শরীর তার, মাথায় জটপাকানো চুল। তার সামনে মাটিতে উপুড় হয়ে আছে থারু।

আরও এগোতে বুড়ো পুরোহিত মুখ তুলে তাকাল আমাদের দিকে। 'কৌতূহলই তোমাদের আমার সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে সমস্ত ভয় ভুলিয়ে দিয়েছে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, সাধু বাবা,' বন্ধুটি উপযুক্ত কোনও কথা খুঁজে পাবার আগেই জবাব দিলাম আমি। 'মাত্র আজই আমি আপনার কথা শুনেছি, আর শোনার সঙ্গে সঙ্গে এসেছি শ্রদ্ধা জানাতে।'

'সাহেব, মিথ্যে বোলো না, সত্যবাদিতার ফলে অনেক কিছু লাভ করা যায়। আমি তোমাদের কে যে আমার এই ক্ষুদ্র রাজ্যে তোমরা প্রবেশ করেছ আমাকে শ্রদ্ধা জানাতে? আমার কাছে তোমরা কিছুই গোপন করতে পারবে না। কৌতূহলই তোমাদের এখানে আসতে বাধ্য করেছে, আর সেই কৌতূহল মিটবেও না, যতক্ষণ না আমি তোমাদের খুলে বলব যে কেন এই বনে আমি একাকী বাস করি, আর কেনই বা আশেপাশের সবাই আমাকে আগুন-বাবা বলে ডাকে।'

আমাদের কথোপকথনের খানিকটা বুঝতে পেরে রেগে গেল আমার বন্ধুটি। শান্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে, হাসিমুখে যোগী বলল, 'যুবক, এই দেশের রহস্য ভেদ করার জন্যে অনেক বছরের সাধনার প্রয়োজন, অথচ প্রায় কিছুই না জেনে রেগে যাচ্ছ তুমি। তোমার রাগের কোনও পরোয়া আমি করি না। সবসময় শান্ত থাকো, আর যে-জ্ঞান তোমার নেই, সেটা অর্জনের চেষ্টা করো; রাগ মানুষকে কিছুই দেয় না। তোমার বন্ধু, এই সাহেব, বহু দিন এই দেশে আছে বলে দু'চারটে রহস্যের খোঁজ রাখে, কিন্তু তারপরেও আজও তার কাছে অনেকটাই অজানা। সে জানে, ভর্ৎসনা করলেও আমরা কারও ক্ষতি করি না।'

'যোগী বাবা,' বললাম আমি, 'আমার এই বন্ধুটির বয়স কম, তাই অভিজ্ঞতাও কম। মনে হচ্ছে, কিছুই আপনার অজানা নয়। আমরা যে আপনার গল্প শুনতে এসেছি, আপনার এই অনুমানও সম্পূর্ণ সত্য। যদি আপনি চান, এই গল্প আমরা কাউকে বলব না।'

'সাহেব, সারা পৃথিবী আমার গল্প জানলেও কিছুই যায় আসে না আমার। তবে কেউই যেন আমার এই আস্তানার কথা না

জানে, কারণ, শান্তিই আমার একমাত্র চাওয়া। পরে এই আস্তানা ত্যাগ করে আবার হয়তো একদিন আমি ফিরে যাব মানুষের মাঝে, কিন্তু আমার একমাত্র শত্রুটিকে বন্ধুতে রূপান্তরিত করার আগে নয়। সারা পৃথিবীতে আমার সেই একমাত্র শত্রু হলো অকৃতজ্ঞ এক হাতি, যে এই মুহূর্তেও আমাদের লক্ষ করছে দূর থেকে।'

সংবাদটা মোটেই সুখকর নয়, ফলে আমরা চারপাশে দৃষ্টি বোলালাম। যোগী হাসল। 'ভয় পাবার কিছু নেই, হাতি এগিয়ে এলে আমার পাহারাদাররা সে-সংবাদ জানিয়ে দেবে।'

'আপনার পাহারাদার,' বললাম আমি, 'কই, আমরা তো কাউকে দেখছি না।'

'দেখবেও না, যতক্ষণ না আমি দেখাব,' ধীরে শিস দিল যোগী, তারপর জোরে।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দু'পাশ থেকে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এল একটা বাঘ আর একটা চিতাবাঘ। আমাদের দিকে তাকিয়ে গজরাতে গজরাতে জানোয়ার দুটো বসল যোগীর দু'পাশে। 'সাহেব, এরাই আমার পাহারাদার। চিতাবাঘটা বুড়ো হয়েছে,' গভীর ভালবাসায় যোগী হাত বুলিয়ে দিতে লাগল বাঘটার গলায়, 'আর এটা তো আমার পাহারাদার হলো ওর বাবা মারা যাবার পর। এরা পাহারায় থাকলে হাতিটা কাছে আসে না। এরা যদি এখনই চলে যায়, আমার সেই শত্রু আমাদের সবাইকে খতম করে দেবে।'

আমার বন্ধু আর আমি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। দু'জনেই অনুভব করছিলাম, স্রেফ কৌতূহল মেটাতে আমরা এসে পড়েছি দারুণ অস্বস্তিকর এক অবস্থায়।

'অনেক আগে,' বলতে লাগল যোগী, 'অনেক বছর আগে

মানুষের মাঝে বসবাস ত্যাগ করে, আমি এসে উপস্থিত হলাম বনের এই নীরবতায়। লোকালয়ের কাছে হওয়ার ফলে কেউ আমার আস্তানা-সম্বন্ধে কোনও ধারণাই করতে পারল না। প্রথম প্রথম গভীর এই বনে আমার কিছুটা ভয় ভয় করতে লাগল, তবে গত দশ বছর থেকে আমি বেশ শান্তিতে আছি। প্রথমে আস্তানা গেড়েছিলাম বড় ওই গাছে, ওখানেই বসে ধ্যান করতে করতে আমি জীব-জানোয়ারের ওপর প্রভুত্ব অর্জনে সমর্থ হই। এখন বনের সমস্ত জীবই আমার বন্ধু, কেবল একটা ছাড়া, সাহেব। আমার একটা ডাকে বনের সব জানোয়ার ছুটে আসবে এখানে, কেবল আসবে না সেই হাতি। তাকে দয়া দেখাতে গিয়ে খানিকটা ব্যথা দেয়ার পর থেকে সে আমার শত্রু।

'একদিক খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে এল আমার কাছে। পরীক্ষা করে দেখলাম, তার পায়ের তলায় ফুটে আছে বাঁশের বড় একটা টুকরো। 'হাতি,' বললাম আমি, 'তোমার ব্যথা সারানো যাবে, কিন্তু খানিকটা ব্যথা না দিয়ে নয়।'

'ব্যথা সারাতে ব্যথা পেলে আমি কিছু মনে করব না।'

'সাহেব, কাঁটাটা তুলে ফেললাম আমি, আর তুলতে গিয়ে প্রায় জীবন হারাতে বসলাম। গর্জে উঠল অকৃতজ্ঞ জানোয়ারটা। যে-চিতাবাঘটাকে তোমরা দেখছ– সেটা আর এই বাঘটার বাবা সময়মত হাতিটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচাল আমার, লাফিয়ে আমি উঠে পড়লাম একটা গাছে। সেই ঘটনার পর থেকে বনের সমস্ত প্রাণীর মধ্যে একমাত্র ওই হাতিই আমার শত্রু। আরেক রাতেও পা টিপে টিপে এসেছিল হাতিটা, কিন্তু সেবারেও অল্পের জন্যে রক্ষা পাই আমি। তারপর ধ্যানের মাধ্যমে অনেক বড় বড় শক্তি অর্জন করি,

যেগুলোর একটার বলে রাতের বেলা আমি রূপান্তরিত হই আগুনে। এটাই আমার একমাত্র প্রতিরক্ষা, কারণ, হাতিরা কেবল আগুনকেই ভয় পায়।

'আগামীতে এসো কোনও রাতে, তা হলে আমাকে দেখতে পাবে আগুনের রূপে। আগুনের মাঝ থেকেই তোমাদের সঙ্গে কথা বলব আমি, তবে মনে রেখো, সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে আসতে হবে তোমাদের; রাতে এই বনে ওত পেতে থাকে নানারকম বিপদ। হাতির পিঠে এলে এই থারুকে রেখো মাহুত হিসেবে। এবার যাও, এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। বাঘটা তোমাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে বনের শেষ সীমা পর্যন্ত। বিদায়।'

যোগীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বন্ধুসহ ফিরতি পথ ধরলাম আমি, পেছনে পেছনে থারু। বনের প্রান্তে পৌঁছুতে, আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে গেল একটা হলদে ঝলক। বুঝলাম, প্রভুর নির্দেশ পালন করে ফিরে গেল বাঘটা। বনের বাইরে আসতেই ফেটে পড়ল ম্যাকলড। প্রথমে খানিকটা গালাগাল করল সে, তারপর বলল, 'আজ আমরা যা দেখলাম, তা বললে ডুয়ার্সের সবাই আমাকে আনানিয়াস কিংবা ব্যারন মুনশাউজেন মনে করবে।'

'কিংবদন্তি আর রহস্যে ভরা ভারত,' বললাম আমি, 'একে কি আমরা কখনোই চিনতে পারব! এখানকার কেবল সেটুকুই আমরা দেখি, যেটুকু আমাদের দেখতে দেয়া হয়; বাইরে থেকে সেগুলোকে অবাস্তব মনে হয়, কিন্তু তার আড়ালেই লুকিয়ে আছে দারুণ বাস্তবের অস্তিত্ব। কেমন লাগবে, বন্ধু, যখন কথা বলে উঠবে আগুন?'

'আগুন কথা বলে উঠবে, তুমি নিশ্চয় ওই গল্প বিশ্বাস করোনি!'

'যা ভাবছ ঠিক তার উল্টো, বিশ্বাস করেছি প্রত্যেকটা কথা। দু'দিন পর আবার আমরা রওনা দেব সূর্যাস্তের সময়। আমাদের হাতির মাহুত হয়ে যে আসবে, সে কিন্তু এখন তোমার কাছে পাঁচ টাকা পায়।'

'না, না, দু'জনের কাছে আড়াই টাকা করে।'

'উঁহুঁ, দামটা তুমিই করেছ।'

ভীষণ বিরক্তির সঙ্গে সে বের করে দিল পাঁচ টাকার একটা নোট।

দু'দিন পর যেদিনের সূর্যাস্তের সময় আমাদের রওনা হবার কথা, সেদিন সকালে ম্যাকলভ একটু অসুস্থ বোধ করল।

'তা হলে না হয় বাদ দাও,' বললাম আমি।

'অসম্ভব,' ভেসে এল তার দৃঢ় জবাব।

যথাসময়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা, আর ঘণ্টাখানেক ধরে হেলতে-দুলতে এসে পৌঁছুলাম বনে। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশে আর কোনও আলো নেই। গাঢ় সেই অন্ধকারের মাঝেই চুপচাপ হাতি চালিয়ে, মাহুত এসে থামল যোগীর আস্তানার দশ গজ সামনে। বাঘের চামড়া, লাউয়ের গামলা, চিমটে সব যথাস্থানে পড়ে আছে, কিন্তু যোগীর কোনও চিহ্ন নেই। বাঘের চামড়ার সামনে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে একটা আগুন, আমাদের চোখের সামনেই সেটা পরিণত হলো একটা শিখায়, আর ঠিক তখনই ভেসে এল একটা স্বর। 'কৌতূহল মেটাবার জন্যে তা হলে বনের বিপদের পরোয়াও তোমরা করোনি—স্বাগতম।'

'কিছু বলবেন না, হুজুর,' ফিসফিসিয়ে সাবধান করে দিল থারু।

মিনিটখানেক পর আবার ভেসে এল সেই স্বর। 'সাদা চামড়ার

মানুষ, তোমরা ভয় না পেলেও ভয়কে অনুভব করতে পারো। আগুনের ভেতর থেকেই কথা বলছি আমি। তোমাদের অপেক্ষায় থেকে থেকে একসময় আমি আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁছুল আমার শত্রু, এল সে আজ অন্যান্য দিনের চেয়ে সামান্য আগেই, ফলে আগুনের রূপ ধরতে বাধ্য হলাম আমি। এখনও সে দূর থেকে লক্ষ করছে আমাদের, তবে যতক্ষণ আমি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলব, সে কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।'

সারা বনের কোথাও কোনও শব্দ নেই, কেবল যোগীর স্বর ভেসে আসছে আগুনের ভেতর থেকে।

'সকালে আমি কোত্থেকে বের হই, তা দেখার জন্যে যুবক রাতটা বনেই কাটাতে চায়। আগুনের ভেতর থেকে আমাকে কথা বলতে শুনে যাবতীয় শক্তির ওপর তার অবিশ্বাস এসেছে। আমার পাহারাদারদের ডাকলেই নিবু নিবু হয়ে আসবে আগুনের শিখা।'

বনভূমির বুক চিরে ধ্বনিত হলো জোর একটা শিস, পরমুহূর্তেই চারপাশ কেঁপে উঠল বাঘের গর্জনে। গুলির মত ছুটে এল বাঘ আর চিতাবাঘটা, আমাদের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে বসল বাঘের চামড়াটার দু'পাশে। আমরা অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, কমে গেল আগুনের উজ্জ্বলতা; কমতে কমতে ওটা যখন প্রায় নিবু নিবু হয়ে এল, ঠিক তখন যেন হেসে উঠল বাঘটা এবার বাঘের শূন্য চামড়াটার দিকে তাকাতে আমরা একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম, তার ওপর বসে শান্ত ভঙ্গিতে আমাদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে বৃদ্ধ যোগী।

'যুবক, এই যে আমি এখানে, বিশ্বাস করো বা না করো,

আগুন থেকেই আমি এসেছি। এই মুহূর্তে আমার দেহ ধারণ করা উচিত হয়নি, তবু আমি কেবল এসেছি তোমাদের বিদায় জানাতে, কারণ, একত্রে তোমাদের সঙ্গে আমার আর কখনোই দেখা হবে না। আমার আগুন নিবে আসছে, আবার তাকে প্রজ্বলিত করতে হবে আমারই দেহ দিয়ে। বিদায়।'

দপ্ করে আবার জ্বলে উঠল আগুনের শিখা, আবার শূন্য পড়ে রইল বাঘের চামড়া, বনের গভীর থেকে ভেসে এল কেবল মট মট করে ডালপালা ভাঙার শব্দ আর একটা হাতির ক্রুদ্ধ চিৎকার। বুঝতে অসুবিধে হলো না, কেন আমাদের এত শিগ্‌গির বিদায় জানাল যোগী।

ঘুরেই দ্রুত হাতি ছোটাল থারু। বনের বাইরে আসতে আঁধার খানিকটা হালকা হয়ে এল

দু'বছর পর দূরত্ব খানিকটা কমাবার জন্যে আমি এগোচ্ছিলাম গয়াবাড়ি আর কার্সিয়ংয়ের মাঝের পথ ধরে। দেখলাম, লেপচাদের একশিলা বিশিষ্ট স্মৃতিস্তম্ভগুলোর কাছে বসে আছে আগুন-বাবা। তাকে দ্রুত অভিবাদন জানিয়েই পা বাড়ালাম আমি, কিন্তু হাত তুলে আমাকে থামার ইশারা করল সে।

'তোমার বন্ধু কোথায়?' জানতে চাইল যোগী।

'মারা গেছে,' জবাব দিলাম আমি।

'হুঁ, আগেই বলেছিলাম যে একত্রে তোমাদের সঙ্গে আমার আর কখনোই দেখা হবে না। যাও, একেবারে শেষ মুহূর্তে ট্রেন ধরতে পারবে তুমি। আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে মহাকালের পাহাড়ে।'

সত্যি কথা বলতে কী, আমি যেন পালিয়ে বাঁচলাম। দার্জিলিং তরাইয়ের সেই ঘটনার পর আগুন-বাবার কথা মনে পড়লেও

শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে আমার। জীবনে অনেক আজব ঘটনা দেখেছি, কিন্তু এটার বেলায় চৌকিদারের সুরেই সুর মেলাব আমি, 'এমন দৃশ্য জীবনে দেখিনি।'

আরও জোরে পা চালালাম, তারপর স্টেশনে পৌঁছে ট্রেনে উঠতেই ছেড়ে গেল সেটা গয়াবাড়ি থেকে।

মূল: এ.সী. রেনি

রূপান্তর: খসরু চৌধুরী

নীলকুঠি হ্রদ

আমার অন্যতম শখ হচ্ছে পাখি শিকার। সময় এবং সুযোগ পেলেই আমি পাখি শিকারে বের হয়ে পড়ি। বিশেষ করে শীত আসলে তো কথাই নেই, প্রতিদিন শিকারে বের হওয়া চাই। চাকরি হওয়ার পর থেকে হাতে বন্দুক ধরার সুযোগ তেমন একটা হয়ে ওঠে না। কর্মস্থল শহরে বলে শিকারে যাবার সুযোগ পাচ্ছি না। তো কিছুদিন থেকে শিকারের নেশা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে এলাম।

বাড়িতে এসে প্রথমে হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম নিয়ে ভাবতে থাকলাম কোথায় শিকারে যাওয়া যায়। হঠাৎ মনে পড়ল ঐতিহাসিক 'নীলকুঠি হ্রদ'-এর কথা। 'জয়ন্তিয়া' নামক স্থানে অবস্থিত নীলকুঠি হ্রদ। আমাদের বাড়ি থেকে তিন-চার ঘণ্টার পথ জয়ন্তিয়া। বাড়ি থেকে রিকশায় ৬ কি. মি. পথ গেলে সামনে পড়ে পাহাড়। সেখান থেকে নেমে বাকি পথ হেঁটে যেতে হয়। যানবাহন চলার উপযোগী রাস্তা এখনও তৈরি হয়নি। তাই একমাত্র পায়ে হেঁটে পাহাড়ী পথ বেয়ে, পাইন বন পেরিয়ে যেতে হয় নীলকুঠি হ্রদ-এ।

যা হোক, ওখানেই শিকারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রচণ্ড শীতে মানস সরোবর থেকে তিতির, মরাল, মালয়ীবক, কালিজ

ফেজান্ট, পানকৌড়ি, সারস ইত্যাদি পাখি অতিথি হয়ে আসে নীলকুঠি হ্রদে। শিকারের জন্যে উত্তম স্থান জয়ন্তিয়া। এতদূর পথ একা যাওয়া সম্ভব নয়, তাই ভাবছি আমরা ছোট মামাকে সাথে নিলে কেমন হয়। মামা বেকার মানুষ, প্রস্তাব পেলে নিশ্চয়ই রাজী হবেন।

সেদিনই কাজের ছেলে মাসুদকে পাঠালাম মামার কাছে। খবর পেয়ে মামা সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন। খুলে বললাম তাকে আমার পাখি শিকারের পরিকল্পনা। আমার চেয়ে বয়েসে সামান্য বড় মামা, প্রায় বন্ধুর মতই সম্পর্ক। আমার প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন।

পাখির মাংস আমাদের দু'জনেরই প্রিয় খাবার। তাই বোধ হয় মামা লোভ সামলাতে পারলেন না। বিশেষ করে পানকৌড়ি, বালি হাঁসের মাংসের স্বাদের কথা মনে হলে তো কথাই নেই, সাথে সাথে আমার জিভে পানি এসে পড়ে। খেতে ভীষণ সুস্বাদু এই পাখিদের মাংস। ছোট মামাকে একবার খাওয়ানোর পর থেকে তিনিও পানকৌড়ির মাংসের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

দু'জনে মিলে ঠিক করলাম কাল ভোর রাতে নীলকুঠি হ্রদ-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করব। সাথে মাসুদকেও নিয়ে যাব। পরিকল্পনা মোতাবেক জিনিস-পত্র গুছিয়ে রাখলাম। খাবার হিসাবে থাকবে ভুনি খিচুড়ি, ফ্লাস্কভর্তি চা, বিস্কুট, চিড়া ও কলা। টুকিটাকি জিনিসের মধ্যে ছুরি, টর্চ, ম্যাচ, মোম, বড় প্লাস্টিক শীট ও বাড়তি জামা-কাপড়। দূরের পথ, কখন কী প্রয়োজন পড়ে বলা যায় না, তাই ইচ্ছে করে বাড়তি জিনিস সঙ্গে নিচ্ছি।

ভোর রাতে আমরা তিনজন ঘুম থেকে উঠে নীলকুঠি হ্রদে

যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলাম। ভীষণ ঠাণ্ডা। পৌষমাসের মাঝামাঝি সময় তখন। আমি আর মামা গায়ে লংকোট চাপিয়ে মাথায় ক্যাপ লাগিয়ে শীত ঠেকিয়েছি। রিকশায় চড়ে পাহাড়ী এলাকা পর্যন্ত গিয়ে নেমে পড়লাম। এখান থেকে আমাদের হেঁটে যেতে হবে বাকি পথ। মাসুদের মাথায় মালামাল আর বন্দুক চাপিয়ে দিয়ে তিনজন দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। কুয়াশায় ঠিকমত পথ দেখা যাচ্ছে না। বিশেষ করে এই পথ আমার এবং মামার কাছে একেবারে নতুন। তবে মাসুদ চেনে।

শীতে হাত-পা ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। তার উপর পাহাড়ী পথ। হাঁটতে যে কত কষ্ট তা বোঝানো যাবে না। যত কষ্টই হোক, নীলকুঠি আমাদের যেতেই হবে, এই আমার প্রতিজ্ঞা। ভাল মত হাঁটতে পারলে ঘণ্টা তিনেকের ভিতর গন্তব্যে পৌঁছুনো যাবে। তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারলেই ভাল, কারণ পাখি শিকারের উপযুক্ত সময় সকাল এবং শেষ বিকেলের দিকটা।

শিশির ভেজা পাহাড়ী পথে হাঁটতে গিয়ে পা পিছলে পড়ার উপক্রম হলো কয়েকবার। মামা তো একবার পড়েই গিয়েছিলেন, আমি না ধরলে হয়তো হাত-পা মারাত্মক ভাবে কেটে যেত। ধরে ফেলা সত্ত্বেও সামান্য কেটে গেছে হাত। টের পেলাম মামার বিরক্তি ধরে গেছে। আমার কিন্তু ভালই লাগছে। বিশেষ করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব লাগছে। ঘাসের উপর শিশির বিন্দু মুক্তোর মত মনে হচ্ছে। ইতিমধ্যে আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। পাহাড়ের চূড়া থেকে সূর্যোদয় অপূর্ব লাগছে। গাছে-গাছে ঘুঘু পাখি চুপচাপ বসে আছে। ইচ্ছে করলে শিকার করতে পারি। কিন্তু না, তাতে অযথা সময় নষ্ট হবে।

হাঁটতে হাঁটতে ঘেমে উঠেছি আমরা। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হাঁটা হলো। আর কিছুক্ষণ হাঁটলে পাইন বনে পৌঁছে যাব। পাইন বনের

পরেই আমাদের গন্তব্যস্থান জয়ন্তিয়ার 'নীলকুঠি হ্রদ'। মামাকে বেশি ক্লান্ত মনে হচ্ছে। পথে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিলাম। এক সময় পাহাড় থেকে পাইন বন চোখে পড়ল। আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। মাসুদ বলল, আর অল্প একটু হাঁটলেই আমরা বনে পৌঁছে যাব। বনের উঁচু গাছগুলোর মাথা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে পুব আকাশে সূর্য অনেক উপরে উঠে এসেছে। পাহাড় পেরিয়ে আমরাও বনে পা দিয়েছি। টুপটাপ শিশির পড়ছে পাইন পাতা থেকে। সমস্ত শরীর ভিজে গেছে আমাদের। আগে কখনও আমি পাইন গাছ দেখিনি। চিকন পাতা ও শাখাযুক্ত এই গাছ দেখতে খুবই সুন্দর। তার উপর সারি দিয়ে লাগানো গাছ। কৃত্রিম বন, সারি দেখলেই বোঝা যায়। বনের মাটি ছোট ঘাসে ভর্তি। ঘাস মাড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছি আমরা। শিশিরে আমাদের শরীর ভিজে যাওয়াতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগছে।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর অবশেষে আমরা হ্রদের তীরে পৌঁছালাম। বিশাল হ্রদ। পরিষ্কার টলটলে নীল পানি। হ্রদের দু'তীরে ছোট বড় দেবদারু গাছ দাঁড়িয়ে। মাঝেমধ্যে অবশ্য দু'একটা শাল গাছও চোখে পড়ছে। ভীষণ পছন্দ হলো আমার হ্রদ এলাকা। কী যে মনোরম দৃশ্য! চারদিকে ভাল করে তাকালাম। আশপাশে কোন ঘর-বাড়ি নেই। তবে অনেক দূরে একটি পোড়োবাড়ি দেখতে পেলাম।

শোনা যায়, বৃটিশ শাসন আমলে এখানে ইংরেজদের কুঠি ছিল। নীল চাষ হত এ এলাকার আশপাশে। সেই থেকে নীলকুঠি নামে পরিচিত এই হ্রদ। বর্তমানে লোকজনের তেমন আসা-যাওয়া নেই। তবে শুনেছি মাঝে-মাঝে শুধু জেলেরা মাছ ধরতে আসে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম প্রায় আটটা বাজে। মাসুদকে

হুকুম করলাম নাস্তা দিতে। নাস্তা খেয়ে হ্রদ থেকে পেট পুরে পানি খেলাম। পানি ভীষণ ঠাণ্ডা। খেতে মিষ্টি লাগল।

খেয়ে-দেয়ে বন্দুক হাতে নিলাম। ঝাঁকে ঝাঁকে অতিথি পাখি পানির উপর ভাসছে। তীরে বড় আকৃতির সারস পাখির দল হেঁটে পোকা-মাকড় খাচ্ছে। পানকৌড়ি লতাগুল্মের উপর বসে রোদ পোহাচ্ছে। শত শত পানকৌড়ি পাখি। যার জন্যে এত দূর পথ পেরিয়ে শিকারে আসা তাদের দেখে আনন্দে মন ভরে উঠল। সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা প্রথমে শুধু পানকৌড়ি শিকার করব। সময় পেলে পরে অন্য সব পাখি মারব। সমস্যা হলো পানকৌড়িরা এলোমেলোভাবে বিচরণ করছে। অন্য সব পাখির মত এরা দলবদ্ধভাবে থাকছে না।

অল্প দূরে কচুরিপানার উপর একটি পানকৌড়ি বসে আছে। প্রথমে টার্গেট নিয়ে গুলি ছুঁড়লাম। ব্যর্থ হলো নিশানা। পাখিটি উড়ে গেল। সামনে এগিয়ে দেখলাম ১২-১৪টি সারসের দল তীরে পোকামাকড় খাচ্ছে। মামা ইশারা দিলেন আমাকে নিশানা নেওয়ার জন্যে। নিশানা ঠিক করে ট্রিগারে চাপ দিলাম। বড় একটি সারস গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। মাসুদ আর মামা সারসটি জবাই করে থলের মধ্যে তুলে রাখল।

হ্রদের উত্তর-পশ্চিম কোণে দু'টি পানকৌড়ি রোদ পোহাচ্ছে দেখে এগিয়ে গেলাম। সতর্কতার সাথে নিশানা নিয়ে ট্রিগারে হাত রাখলাম। গুলি এইবার ব্যর্থ হলো। এত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও পানকৌড়িটির গায়ে গুলি লাগাতে পারিনি আমি। পানকৌড়িগুলো ভীষণ চালাক। এদের শিকার করাটাও দুরূহ ব্যাপার।

প্রায় ১ কি. মি. হেঁটে হ্রদের অন্য তীরে গিয়ে দেখতে পেলাম কয়েকটি পানকৌড়ি পানিতে ডুব দিচ্ছে। আর দেরি না করে নিশানা নিয়ে ট্রিগারে চাপ দিলাম। চমৎকার! এইবার গুলি

পাখিটির ডানায় গিয়ে লেগেছে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে মাত্র ৩টি পানকৌড়ি, ২টি সারস, ২টি বালিহাঁস শিকার করলাম।

মাসুদকে আমরা জিনিস-পত্র পাহারা দিতে হ্রদের অন্য তীরে রেখে এসেছি। দুপুর ২টা বাজে। তাই এখনকার মত শিকার থামিয়ে মাসুদের কাছে ফিরে আসছি। খেয়ে বিশ্রাম নেব কিছুক্ষণ। তারপর বিকেলের দিকে আবার বের হব। দু'জনে গল্প করতে করতে হাঁটছি। এমন সময় ১৭-১৮ বছরের একটি যুবতী মেয়ে আমাদের সামনে পড়ল। সকাল থেকে কোনও লোকজন দেখিনি। এই প্রথম একজন মানুষের সাক্ষাৎ পেলাম। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার বাড়ি কোথায়?'

আঙুল দিয়ে ইশারায় অদূরের পোড়োবাড়িটি দেখিয়ে বলল, 'ওই যে।'

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর কে থাকে তোমার সাথে?'

জবাব না দিয়ে মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল।

মামা যুবতীর নাম জানতে চাইলেন।

বিষণ্ণ হেসে আস্তে করে জবাব দিল, 'আমার নাম রেশমা।'

রেশমার শরীরের বর্ণ কুচকুচে কালো। উষ্কখুষ্ক চুল, পরনে সাদা ময়লা কাপড়। দেখে বোঝা যায় গরীবের সন্তান। মামা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন মেয়েটির দিকে। এমন বিস্ময় নিয়ে মেয়েটিকে দেখছেন, যেন মেয়ে মানুষ এই প্রথম নজরে পড়ল। রেশমার তাকানোর ভঙ্গি দেখে আমার শরীর শির শির করে উঠল। কেন জানি না আমার অসহ্য লাগল।

যা হোক, আমরা অযথা সময় নষ্ট না করে হাঁটতে লাগলাম। রেশমা আমাদের বিপরীত দিকে হেঁটে চলে গেল। মামাকে বললাম, 'এদিকে তা হলে লোকজন বসবাস করে?'

মামা বললেন, 'মেয়েটিকে দেখে তো তাই-ই মনে হচ্ছে।'

আমরা মাসুদের কাছে ফিরে এসেছি। সে ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমাচ্ছে। তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে আমরা হ্রদে নেমে গোসল করলাম। প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও মামা কিছুক্ষণ সাঁতার কাটলেন। গোসল সেরে ভুনি খিচুড়ি খেতে বসলাম তিনজনে মিলে। খাওয়া আধাআধি হয়েছে, ঠিক এমন সময় আমাদের পিছনের গাছের আড়াল থেকে কে যেন খিল খিল করে হেসে উঠল। চমকে উঠলাম আমরা। মামা বললেন, 'মেয়েদের হাসি মনে হচ্ছে।'

মাসুদ বলল, 'এর আগেও আমি একবার এমন হাসি শুনতে পেয়েছি, কিন্তু কাউকে দেখিনি।'

ভালমত চারদিকটা খোঁজ করলাম। কিন্তু কোথা থেকে যে হাসির শব্দ এল তা বের করতে পারলাম না। ভাবলাম হয়তো আশপাশে কেউ ঘোরাফেরা করছে। যাক গে, সেটা নিয়ে আমরা তেমন মাথা ঘামাইনি তখন।

বাকি খিচুড়িটুকু খেয়ে মাসুদকে বললাম, 'তুই গাছে উঠে কয়েকটা ডাল কেটে নিয়ে আয়, তাঁবু তৈরি করব। রাত্রে থাকতে হবে আমাদের। তুই সন্ধ্যার আগে পাখিগুলো নিয়ে বাড়িতে চলে যাবি। আর শোন, বাড়িতে বলবি আমরা আগামীকাল আসব।'

রাতে পাখি শিকার করতে সুবিধা বেশি। টর্চের আলো পাখির চোখে মারলে একদম চুপ-চাপ বসে থাকে। আরেকটা সুবিধে হলো, গুলির আওয়াজ শুনে পাখি উড়ে যায় না।

মাসুদ ছুরি নিয়ে তরতর করে গাছে উঠে গেল, তারপর কয়েকটি ডাল কেটে নীচে ফেলল। হঠাৎ সে 'বাবারে!' বলে চিৎকার দিল এবং আমাদের উদ্দেশ্যে বলল, 'ভাই, কে যেন আমাকে একটা থাপ্পড় দিল!'

মামা আর আমি একযোগে বলে উঠলাম, 'পাগলের মত কী

যা তা বলছিস্! নীচে নেমে আয় দেখি।'

মাসুদ গাছ থেকে দ্রুত নেমে মাটিতে আছড়ে পড়ল।

মামা বললেন, 'কী হয়েছে, খুলে বল।'

মাসুদ হাঁপাতে হাঁপতে বলল, 'এই দেখুন আমার গাল।'

চেয়ে দেখি সত্যিই মাসুদের গালে আঙুলের দাগের মত লাগছে। ভয় পেয়ে গেলাম আমরা।

'ব্যাপার কী!' বলে আমি আর মামা একে অপরের দিকে তাকালাম। ভয় পাওয়া সত্ত্বেও বুকে সাহস নিয়ে বললাম, 'দূর! হয়তো গাছের ডালে আঘাত খেয়েছিস্।'

মামা মাসুদকে তাঁবু টাঙাবার তাগাদা দিলেন। আমিও তাঁবু তৈরির কাজে লেগে গেলাম। আসার সময় ১০-১২ গজ লম্বা দুই প্রস্থ প্লাস্টিক শীট নিয়ে এসেছি। তাই দিয়ে তাঁবু তৈরি হবে। বেশ কিছুক্ষণ খেটে ৫-৬টি খুঁটি পুঁতে তার উপর প্লাস্টিক দিয়ে সুন্দর তাঁবু বানিয়ে ফেললাম। আপাতত গায়ে শিশির লাগবে না। তারপর শুকনো পাতা এনে বিছানা পাতলাম।

তাঁবু তৈরির কাজ শেষ করে মাসুদকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম। এ দিকে সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এল। আস্তে আস্তে একটা ভয় জাগছে মনে। সারা দিনে রেশমাকে ছাড়া অন্য কোন লোকজন দেখিনি। তার উপর মাসুদের গায়ে থাপ্পড় এবং হাসির শব্দ মিলিয়ে মনে হলো কেমন জানি ভৌতিক পরিবেশে এসে পড়েছি। সারাটা দিনে ভয়ের লেশ মাত্র ছিল না। এখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসায় এবং মাসুদ চলে যাওয়ায় ভয় যেন আমাকে আঁকড়ে ধরল। তবে পানকৌড়ি শিকারের নেশায় সব ভয় মন থেকে মুছে গেল একটু পরই।

সন্ধ্যার অন্ধকার পুরোপুরি নেমে গেছে। পাখিরা গাছে-গাছে আশ্রয় নিয়েছে। পাখিদের কিচির-মিচির শব্দে হ্রদ এলাকা মুখরিত

হয়ে উঠল। এক সময় পাখিদের ভিতর নীরবতাও নেমে এল। মামাকে একবার ভয়ের কথা জানালাম। হেসে উড়িয়ে দিয়ে মামা বললেন, 'চুরি ডাকাতি হওয়ার মত তেমন কিছু আমাদের সাথে নেই। সুতরাং ভয় পাওয়ার কারণ দেখছি না।'

'না মামা, তা নয়। আমি ভাবছি অন্য কথা।'

মামা বললেন, 'ভূতের কথা বলছিস্?'

আমি বললাম, 'না, ভূতের ভয় পাব কেন! নির্জন পরিবেশে একা একা এমনিই ভয় লাগছে।' মনে মনে ভাবলাম মাসুদকে বাড়ি পাঠানো ঠিক হয়নি। তিনজন থাকলে ভয় একটু কম লাগত।

চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিকেল বেলায় খড়, লতা-পাতা কুড়িয়ে রেখেছি। তাই-ই জ্বালিয়ে দিলাম। আলো এবং উত্তাপ দুটোই ভাল লাগছে। অবশ্য সাথে মোমও আছে, প্রয়োজন পড়লে জ্বালাব। অন্ধকার গভীর হতেই আমরা শিকার করতে বেরিয়ে পড়লাম। সাথে নিলাম টর্চ, বন্দুক,ছরি।

শীতের রাত। কুয়াশা পড়ছে টুপটাপ করে। অন্ধকার এবং ঠাণ্ডায় গাছে-গাছে পাখিরা জড়ো-সড়ো হয়ে আছে। টর্চ মেরে পাখিদের করুণ অবস্থা দেখছি। শত-শত পাখি ডালে বসে ঝিমুচ্ছে। পাখিদের অসহায় অবস্থা দেখে আমার মনে মায়া লেগে গেল। তবুও সর্বনাশা নেশায় পাগল হয়ে উঠলাম।

মামা পাখি ও বন্দুকের নিশানা এক করে টর্চ ধরলেন। আর আমি ট্রিগারে চাপ দিয়ে যেতে লাগলাম একের পর এক। স্বল্প সময়ের মধ্যে ৬টি পানকৌড়ি, ৩টি অন্যান্য পাখি শিকার করে ফেললাম। শিকারের নেশায় সে মুহূর্তে দুনিয়ার সব কিছু ভুলে গেলাম।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর পর্যন্ত চলে এলাম আমরা। সামনে

বড় আকারের একটি দেবদারু গাছ দেখে মামা থামলেন। বললেন, 'এই ঝাঁকড়া গাছে অনেক পাখি থাকতে পারে।'

মামার লোভনীয় প্রস্তাব শুনে বললাম, 'ঠিক আছে, দেখি, টর্চ মারেন।'

পাঁচ ব্যাটারির টর্চ বোতাম টিপলেই অনেক দূর পর্যন্ত আলো ছড়ায়। আলোর বন্যায় গাছের পাতার শিরা-উপশিরা নজরে পড়ছে আমাদের চোখে। অনেকগুলো পাখি ডালে বসে ঝিমাচ্ছে। আলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রত্যেক ডালে দেখছি। হঠাৎ সাদা ও লম্বা কী যেন একটা দেখলাম মগ ডালে। এত বড় তো পাখি হয় না। ভাল করে তাকালাম দু'জন। যা দেখলাম তাতে আমাদের পিলে চমকে উঠল। দু'জন-দু'জনকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠলাম। অবশ্য যা দেখলাম তাতে চিৎকার না দিয়েও পারতাম না। দুর্বল হৃদয়ের কেউ হলে হয়তো ভয়ে জ্ঞান হারাত।

মামা টর্চের আলোয় যে জিনিস আমাদের চোখে পড়ল সেটা হলো মানুষ! দুপুর বেলায় দেখা সেই যুবতী মেয়েটি। গাছের ডালে বসে আছে। মুখ দিয়ে আমাদের কোনও কথা বের হলো না কিছুক্ষণ। মামার সাহস বেশি হলেও এই অবস্থায় মেয়েটিকে দেখে তিনিও ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন। তবুও মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই মেয়ে! এত রাতে গাছে বসে আছ কেন? কী করছ?' তোতলাচ্ছেন মামা।

মেয়েটি হেসে হেসে জবাব দিল, 'পাখির বাচ্চা ধরতে এসেছি। রাত না হলে ধরা যায় না।'

ভয় কিছুটা কেটেছে আমাদের। মেয়েটির জবাব শুনে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'একা এত রাতে তোমার ভয় করে না?'

খিলখিল করে হেসে জবাব দিল, 'ভয়! কীসের ভয়! এই এলাকা তো আমাদেরই। তা ছাড়া ওই তো আমাদের বাড়ি দেখা যায়।'

ভাবলাম গরীবের মেয়ে, এদের ভয় বলে কিছু নেই, এরা সব কিছুই পারে। গাছে ওঠা তো মামুলী ব্যাপার। কিন্তু তাই বলে এত রাতে! তাও আবার এই নির্জন পরিবেশে একা! মনকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না। মেয়েটির আচরণে আমার সন্দেহ লাগছে, কিন্তু আগা-মাথা কিছুই না বোঝার কারণে তার চিন্তা বাদ দিয়ে শিকারে মনোযোগ দিলাম।

প্রায় ২-৩ ঘণ্টা শিকার করার পর অনেকগুলো পাখি মেরেছি। এইবার তাঁবুতে ফেরার পালা। শীতে শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। আমরা তাঁবুতে ফিরে এলাম।

তাঁবুতে ফিরে মোম ধরিয়ে চিড়া, বিস্কুট আর কলা দিয়ে রাতের খাবার সেরে নিলাম। পেট পুরে খেয়ে শুয়ে পড়লাম। বালিশ ছাড়াই শুতে হলো আমাদের। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কোট গায়ে দিয়েই শুয়ে পড়লাম। কিছুতেই আমার ঘুম আসছে না। বাইরে খুব শিশির পড়ছে। প্লাস্টিকের উপর শিশির পড়ার শব্দ শুনে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে।

ঘণ্টা দুয়েক পর মামা গুঙিয়ে উঠলেন পেটব্যথা বলে। আমি কিছুক্ষণ পেট মালিশ করে দিলাম। কিছুতেই উপশম হচ্ছে না। অল্পক্ষণ পর মামা বমি করে দিলেন। তার মিনিট দশেক পর শুরু হলো পুরোদস্তুর ডায়রিয়া।

মামার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে লাগল। কী করব ভেবে পাচ্ছি না। স্যালাইন খাওয়ানো একান্ত প্রয়োজন। আমাদের সাথে লবণ আছে, কিন্তু গুড় পাই কোথায়। হঠাৎ মনে পড়ল রেশমা নামের মেয়েটির কথা। তার বাড়ি গেলে হয়তো চিনি বা গুড় পাওয়া যেতে পারে। সমস্যা হলো মামাকে একা রেখে কীভাবে যাই। কেন যে মাসুদকে পাঠিয়ে দিলাম! বোকামির জন্যে মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করলাম।

ভেবে-চিন্তে মামাকে একা রেখে রেশমাদের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম। খোদা জানে মামাকে এসে জীবিত পাই কিনা। রাত তখন পৌনে একটা বাজে। মামার কাহিল অবস্থা দেখে মন থেকে ভয় চলে গেছে। এই মুহূর্তে একটাই চিন্তা যে করে হোক মামাকে সুস্থ করে তুলতে হবে।

প্রায় মিনিট পঁচিশ হাঁটার পর সেই পোড়োবাড়িতে এলাম রেশমার খোঁজে। বিশাল বাড়ি। দালানের উপর সিমেন্টের প্রলেপ একটুও নেই। সব খসে পড়ে ইঁটগুলো বের হয়ে আছে। পুরানো আমলের বাড়ি, দুর্গের মত মনে হচ্ছে। নির্জন পরিবেশ। একটু একটু ভয় লাগছে এখন আমার। বাড়িতে অনেকগুলো কামরা। কোন কামরায় যে রেশমারা থাকে তাও জানি না। জোরে রেশমা বলে কয়েকবার ডাকলাম। কোন সাড়া পাইনি। ব্যাপার কী? বাড়ির লোক সব গেল কোথায়! সামনের কামরায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে টর্চের আলো জ্বেলে দেখলাম সমস্ত ঘর ফাঁকা, কোথাও কেউ নেই। শুধু মাকড়সা ও তেলাপোকারা ছুটোছুটি করছে। আমার শরীর শিউরে উঠল। কী করে এই বাড়িতে রেশমারা থাকে। আরও কয়েকবার রেশমাকে ডাকলাম। কোন সাড়া নেই। পাশের কামরাতে ঢুকলাম। এই কামরাও ফাঁকা। আছে শুধু চামচিকা। উড়ে-উড়ে ঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাচ্ছে। একটা চামচিকা আমার মাথায় এসে পড়ল। লাফিয়ে উঠলাম। এই মুহূর্তে আমার ভীষণ ভয় লাগছে। পরপর কয়েকটি কামরায় প্রবেশ করে একই অবস্থা নজরে পড়ল। অজানা আশঙ্কায় প্রচণ্ড শীতের মধ্যে আমার জুলফি বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগল। এই বুঝি কিছু একটা হলো। রেশমাকে ডাকতে পারছি না। যেন বাক শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। নীরব নিস্তব্ধ প্রেতপুরী মনে হচ্ছে বাড়িটিকে।

খস্‌খস্‌ আওয়াজ এল পাশের একটি কামরা থেকে। এগিয়ে গেলাম সেদিকে। বাইরে থেকেই শিকল লাগানো। ভাঙা জানালা আছে একটি। এগিয়ে গিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে টর্চের আলো ফেললাম। দেখলাম ভিতরে পুরানো ভাঙা খাটের উপর কে যেন একজন কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে। এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলাম। 'এই যে, ঘরে কে আছেন,' বলে কয়েকবার ডাকলাম। সাড়া মিলল না। ভাবলাম শীতের ভিতর কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকাতে হয়তো শুনতে পাচ্ছে না। তাই শিকল খুলে ঘরের ভিতর ঢুকলাম। খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। লোকটা নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। মৃদু স্বরে দু'তিনবার ডাকলাম। ভাবছি হঠাৎ ভয় পেয়ে চোর ভেবে চিৎকার দেয় কিনা। মামার অবস্থা ভেবে সব ভুলে আবার তাকে ডাকলাম। সাড়া না দিয়ে লোকটি পাশ ফিরে শুলো। এইবার জোরে ডাকলাম। না, কোন সাড়া নেই। হাত বাড়িয়ে আমি তার মুখের উপর থেকে কাঁথাটি সরিয়ে ফেললাম। একী! কী দেখছি আমি! এ তো মানুষের কঙ্কাল! মানুষ গেল কোথায়। অল্পক্ষণ হলো নাক ডাকার শব্দ শুনলাম না? তা ছাড়া, নিজ চোখে দেখলাম পাশ ফিরে শুতে। অথচ এখন কী দেখছি?

ভয়ে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলব মনে হচ্ছে। কয়েক ফোঁটা ঘাম জুলফি বেয়ে নীচে পড়ল। পা কাঁপছে। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। আর এক মুহূর্তও দেরি না করে ঘর থেকে বের হয়ে আমি দৌড়াতে লাগলাম। এক দৌড়ে দেবদারু গাছটার কাছে চলে এলাম যে গাছটাতে সন্ধ্যায় রেশমাকে বসে থাকতে দেখেছি।

পা অবশ হয়ে আসছে আমার। বুক হাপরের মত ওঠানামা করছে। সামান্য একটু জিরিয়ে তাঁবুতে ফিরে যাব। রেশমার

ফাঁকির কথা মনে পড়ল। মিথ্যে কথা বলেছে সে। সে আসলে পোড়োবাড়িতে থাকে না।

কৌতূহল নিয়ে গাছে টর্চ মেরে দেখলাম। আলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে কী যেন একটা চোখে পড়ল। এইবারও আশ্চর্য হতে হলো আমাকে। চেয়ে দেখি রেশমা ফাঁসি দিয়ে মরে আছে! তার জিভ আট-দশ ইঞ্চি বেরিয়ে আছে। চোখ দুটিও বেরিয়ে পড়ার মত অবস্থা। মনে হচ্ছে আমার দিকে তাকিয়ে আছে রেশমা। আলো পড়তেই ঝলসে উঠল চোখ। অন্ধকারে কুকুর-বিড়ালের চোখ যেমন জ্বলে ওঠে, ঠিক তেমন মনে হলো। আশ্চর্য হলাম মানুষের চোখ অন্ধকারে জ্বলতে দেখে। তার উপর মৃত মানুষ। আগেও কয়েকটি ফাঁসির লাশ দেখেছি আমি। কিন্তু কারও জিভ এবং চোখ এত বেশি বেরিয়ে থাকতে দেখিনি। এতক্ষণে প্রশ্ন জাগল মনে, কে এই মেয়ে? এই জনমানব শূন্য এলাকায় ফাঁসি নিতে এল কেন?

এতকিছু ভাবার সময় নেই। আমি আবার দৌড়ে তাঁবুতে ফিরে এলাম। মামা ক্ষীণ স্বরে আমাকে ডাকছে। মামার কাছে গিয়ে বসে পড়লাম। প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছি। কোন মতে মামার মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন কেমন আছেন?'

সামান্য মাথা নেড়ে মামা চোখ বুজে ফেলেন। এই মুহূর্তে তাঁকে কিছু বলা সম্ভব না, তাই চুপ-চাপ রইলাম।

মামার সমস্ত শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা। আমার কোটটি খুলে তাঁকে পরিয়ে দিলাম। চিনি বা গুড় না পেয়ে শুধু মাত্র লবণ গুলানো পানি পান করাতে থাকলাম। সকাল পর্যন্ত বাঁচানো যায় কিনা সন্দেহ লাগছে। অনবরত লবণ পানি পান করাচ্ছি মামাকে।

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। মামা মারা গেলে কী যে

পরিস্থিতিতে পড়তে হবে, ভেবে সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে। কঙ্কাল, ফাঁসির লাশ, মামার ডায়রিয়া সব মিলিয়ে আমার ভয় কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে বুঝতেই পারছেন।

সকাল হয়ে এসেছে। মামার ডায়রিয়া একটু কমেছে। বুদ্ধি করে লবণ পানি পান করানোতে পানি শূন্যতা থেকে রেহাই পেয়েছেন।

শিকারের প্রতি এখন আর নেশা নেই। দেখতে পেলাম হ্রদে অনেকগুলো পানকৌড়ি ভাসছে। দ্বিতীয়বার তাকাইনি সেদিকে। এই মুহূর্তে এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু মামাকে নিয়ে সমস্যা। অসুস্থ শরীর নিয়ে হাঁটতে পারবেন না তিনি।

রাতের সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম মামাকে। তিনি যে আমার কথা বিশ্বাস করলেন না, বুঝতে পেরেছি। মামা দেখতে চাইলেন লাশ ও কঙ্কাল। বললাম, 'আসেন আমার সাথে।'

আস্তে আস্তে হেঁটে প্রথমে দেবদারু গাছের কাছে গেলাম। ভয়ে আমি গাছের উপর তাকালাম না। মামাকে বললাম, 'দেখুন গাছের উপর তাকিয়ে।'

মামা গাছের উপর তাকিয়ে অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে বললেন, 'কোথায় গেল ফাঁসির লাশ?'

অবাক হলাম মামার কথা শুনে। বলেন কী? আমিও তাকালাম গাছের উপর। সত্যিই তো লাশ নেই!

টিপ্পনি কাটলেন মামা, বললেন, 'তোমার সে লাশ হয়তো রাতেই উড়ে চলে গেছে।'

ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে আমার। নিজ চোখে রাতে লাশ দেখছি অথচ এখন কিছুই নেই। হাওয়া হয়ে গেল নাকি? এত সকালে এখানে কেউ আসেনি যে লাশ নিয়ে যাবে। তা ছাড়া,

লোকজন এলে তো আমরাও দেখতাম। মামাকে বললাম, 'ঠিক আছে কঙ্কাল দেখে যান।'

দুরু-দুরু বুকে গিয়ে ঢুকলাম পোড়োবাড়ির সেই কামরায়। ভেতরে ঢুকে ভাল মত চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম খাট ছাড়া আর কিছুই নেই। কেমন জানি গোলক ধাঁধায় পড়লাম আমি। গেল কোথায় সব!

মামা তো হেসেই খুন। বললেন, 'মাতাল কোথাকার, আমার ডায়রিয়া দেখে হুঁশ হারিয়ে ফেলেছিলি, তাই না?'

মামার মন্তব্য শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গেল।

সেখানে আর না দাঁড়িয়ে থেকে আমরা তাঁবুর দিকে ফিরছি। ঠিক তখনই পিছন থেকে হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। থমকে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকালাম। এ কী! এ যে দেখি রেশমা দাঁড়িয়ে আছে। মামা আবারও আমাকে টিপ্পনি কেটে বললেন, 'কী রে, তোর ফাঁসির লাশ তো ভালই হাসতে জানে। খুব সুন্দর হরর গল্প শুনিয়েছিস।'

কথা না বলে তাঁবুতে দু'জন ফিরে এলাম।

তাঁবুতে ফিরে এসে জিনিস-পত্র গোছগাছ করে বাড়ির পথ ধরলাম। ভাবলাম যত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। কিছুক্ষণ হাঁটার পর পথে একদল জেলের সাথে দেখা হলো। লক্ষ করলাম, জেলেরা আমাদের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কিছু বলার আগেই একজন জেলে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা এত সকালে কোথা থেকে এসেছেন?'

বললাম, 'নীলকুঠি হ্রদ থেকে।'

নীলকুঠি হ্রদের নাম শোনার সাথে সাথে তাদের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। তারা আমাদের আপাদমস্তক আরেকবার তাকিয়ে বলল, 'নীল…কুঠি…হ্রদ।'

মামা বললেন, 'কেন, কী হয়েছে?'

জেলেরা বলল, 'ওই জায়গায় সাধারণত কেউ যায় না। গেলে অমঙ্গল হয়...।'

পুরো কথা শেষ না করে তারা দ্রুত হেঁটে চলে গেল। মামা জেলেদের কথা শুনে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। বুঝতে পারলাম, মামা এইবার ভয় পেয়েছেন। কোন কথা না বলে আমাকে তাড়া দিলেন দ্রুত হাঁটার জন্যে।

আলম শাইন

ধূসর-আতঙ্ক

সারা হপ্তা ধরে উত্তুরে হাওয়া বইবার কথা বলছিল ওরা। বিষুদবার হামলে পড়ল ঝড়। বিকেল চারটার মধ্যে আট ইঞ্চি তুষার জমে উঠল রাস্তায়, থামার কোনও লক্ষণ নেই। আমরা অভ্যাসমত বিকেল পাঁচটা/ছ'টার দিকে হাজির হয়ে গেলাম হেনরি'র 'নাইট আউল'-এ। ব্যাঙ্গোরের এই একটাই মাত্র দোকান যা ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় খোলে।

হেনরি কেউকেটা কোনও ব্যবসায়ী নয়, কলেজ ছাত্রদের কাছে বিয়ার আর মদ বিক্রি করে। আমাদের মত অকর্মার ধাড়িদের আড্ডার চমৎকার জায়গা হেনরির বার।

আজ বিকেলে হেনরি বসেছে কাউন্টারে। আমি, বিল পেলহ্যাম, বার্টি কনরস আর কার্ল লিটলফিল্ড ঘিরে বসেছি চুল্লি। বাইরে, ওহায়ো স্ট্রীটে কোনও গাড়ি চলছে না। বৈদ্যুতিক লাঙল দিয়েও জমাটবাঁধা তুষার কাটতে গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে লোকগুলো। শোঁ শোঁ শব্দে বইছে প্রবল হাওয়া। ডাইনোসরের মেরুদণ্ডের মত উঁচু আর স্তূপ হয়ে আছে তুষার বাড়িঘরের ছাদে।

হেনরির দোকানে আজ বিকেলে খদ্দের বলতে মোটে তিনজন– অবশ্য কানা এডিকে যদি এর কাতারে ফেলা যায়।

এডির বয়স সত্তরের কাছাকাছি, পুরোপুরি অন্ধ নয় সে। হপ্তায় দু'তিনদিন আসে সে এখানে। কোটের নীচে ব্রেড লুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়, 'তোমাদেরকে আবার কেমন বোকা বানালাম' এমন ভাব নিয়ে। হেনরি এডিকে পছন্দ করে বলে তার কাছ থেকে কখনোই রুটির দাম রাখে না।

আমরা বসে আড্ডা দিচ্ছি, হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল দরজা, ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঝাপটা নিয়ে। টলতে টলতে ভিতরে ঢুকল এক কিশোর। মেঝেতে পা ঠুকে জুতো থেকে বরফ ঝাড়ছে। ওকে দেখেই চিনে ফেললাম। রিচি গ্রেনাডাইনের ছেলে। চেহারায় তীব্র উৎকণ্ঠা। মুখ ফ্যাকাসে। কণ্ঠমণি ওঠা-নামা করছে, ঘন ঘন ঢোক গিলছে বলে।

'মি. পার্মালি,' হেনরির উদ্দেশে বলল সে, চোখের মণি ঘুরছে সকেটের মধ্যে। 'আপনাকে এখুনি একবার আসতে হবে। ওঁর জন্য বিয়ার নিয়ে যাব। আমি ও বাড়িতে আর ফিরতে চাই না। আমার ভয় লাগছে।'

'একটু সুস্থির হয়ে বসো,' কসাই'র সাদা অ্যাপ্রনটা খুলে রেখে কাউন্টার ঘুরে এল হেনরি। 'কী হয়েছে? তোমার বাবা মাতাল হয়ে গেছে?'

হেনরির কথায় বুঝলাম রিচি বেশ কয়েকদিন ধরে ওর দোকানে আসছে না। প্রতিদিনই ওর একটা বিয়ার চাই, সবচেয়ে সস্তাটা কিনবে সে। বিশালদেহী, মোটকু রিচি বিয়ার খেতেও পারে। ক্লিফটনের করাত-কলে কাজ করত সে। কিন্তু কী একটা ভুলের অপরাধে চাকরিটা চলে যায়। করাত-কল কোম্পানি অবশ্য ওকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল। চাকরি ছাড়ার পর থেকে সারাদিন বিয়ার খেতে খেতে আরও ফুলেছে রিচি। এখন ছেলেকে পাঠায় বিয়ার কিনতে।

'বাবা মাতাল হয়েছে,' শুনতে পেলাম ছেলেটা বলছে। 'কিন্তু সমস্যা সেটা নয়। সমস্যা... সমস্যা... ওহ্, ঈশ্বর, ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর!'

হেনরি কার্লকে বলল, 'কার্ল, তুমি এদিকে দু'মিনিট খেয়াল রাখতে পারবে?'

'অবশ্যই।'

'বেশ। টিমি স্টকরুমে চলো। শুনি কী হয়েছে।'

ছেলেটাকে নিয়ে চলে গেল হেনরি। কার্ল কাউন্টারে এসে বসল হেনরির টুলে। কেউ কিছুক্ষণ কোনও কথা বলল না। আমরা হেনরির গভীর, ধীর গলা শুনতে পেলাম। টিমি উত্তেজিত ও দ্রুত কণ্ঠে কথা বলছে। তারপর ফুঁপিয়ে উঠল সে।

বিল পেলহ্যাম গলা খাঁকারি দিয়ে পাইপে তামাক ভরতে লাগল।

'রিচিকে অনেকদিন দেখি না।' বললাম আমি।

ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল বিল, 'তাতে কিছু আসে যায় না।'

'অক্টোবরের শেষে একবার এসেছিল,' জানাল কার্ল। 'হ্যালোউইনের সময়। এক কেস বিয়ার কিনল। দিনদিন ফুলে যাচ্ছিল ও।'

তারপর আর কিছু বলার মত পেলাম না। ছেলেটা এখনও কাঁদছে। তবে কাঁদতে কাঁদতে কথাও বলছে। বাইরে গর্জন ছাড়ছে বাতাস, দরজা-জানালায় চাবুক কষাচ্ছে। রেডিওতে বলল সকালের মধ্যে আরও ছয় ইঞ্চি পুরু হয়ে বরফ পড়বে। এখন জানুয়ারির মাঝামাঝি। ভাবছিলাম অক্টোবরের পর থেকে রিচির চেহারা আদৌ কেউ দেখেছে কিনা।

আরও কিছুক্ষণ ছেলেটার সঙ্গে কথা বলল হেনরি।

তারপর ওকে নিয়ে বেরিয়ে এল। ছেলেটা কোট খুলে ফেলেছে, তবে হেনরি তার কোট গায়ে চাপিয়েছে। ছেলেটার বুক হাঁপরের মত ওঠা-নামা করছে, চোখ লাল।

হেনরিকে উদ্বিগ্ন দেখাল। 'টিমিকে ওপরে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। ওর খিদে পেয়েছে। আমার বউ ওকে খাইয়ে দেবে। আমি রিচির বাসায় যাব। তোমরা কেউ আমার সঙ্গে চলো। টিমি বলল ওর বাপের বিয়ার লাগবে। টাকাও দিয়েছে।' হাসার চেষ্টা করল হেনরি, কিন্তু হাসি ফুটল না মুখে।

'কী বিয়ার?' জানতে চাইল বার্টি। 'আমি নিয়ে আসি।'

'হ্যারোস সুপ্রিম,' বলল হেনরি। 'কয়েকটা প্যাকেট আছে ওখানে।'

আমি উঠে পড়লাম। হেনরির সঙ্গে বার্টি যাবে, আমাকেও যেতে হবে। ঠাণ্ডায় কার্লের বাতের ব্যথাটা বেড়েছে। আর বিলি পেলহ্যাম এখানেই থাকছে।

বার্টি হ্যারোস-এর চারটে প্যাকেট নিয়ে এল। ওগুলো বাক্সে ভরলাম আমি। হেনরি দোতলায়, ওর বাসায় নিয়ে গেল ছেলেটাকে। টিমিকে বউয়ের কাছে রেখে নেমে এল নীচে। মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিল সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ আছে কিনা। বিলি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'হয়েছেটা কী? রিচি মেরেছে ছেলেটাকে?'

'না,' বলল হেনরি। 'আমি এখনই কিছু বলতে চাই না। শুনলে পাগলের প্রলাপ মনে হবে। তবে একটা জিনিস দেখাচ্ছি। টিমি বিয়ারের দাম দেয়ার জন্য যে টাকাটা এনেছে ওটা দেখো।' পকেট থেকে চারটে ডলার বের করল হেনরি, রাখল কাউন্টারের কিনারে। টাকাগুলোর গায়ে ধূসর, পিচ্ছিল, ঘিনঘিনে কী একটা জিনিস লেগে আছে। কার্লকে বলল, 'এ

টাকা কেউ যেন না ছোঁয়। ছেলেটা যা বলেছে তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয় এ টাকায় হাত দেয়া যাবে না।'

মাংসের কাউন্টারে গিয়ে সিঙ্কে হাত ধুয়ে নিল হেনরি।

আমি গায়ে কোট চাপালাম, গলায় মাফলার বেঁধে নিলাম। গাড়ি নিয়ে লাভ হবে না, তুষার ঠেলে যেতে পারব না। রিচি কার্ভ স্ট্রিটের একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ থাকে। এখান থেকে হাঁটা পথের দূরত্ব।

আমরা বেরুচ্ছি, বিল পেলহ্যাম বলল, 'সাবধানে যেয়ো।' হেনরি শুধু মাথা ঝাঁকাল। হ্যারোস-এর বিয়ারের কেস ছোট একটি হ্যান্ডকার্টে রেখেছে, দরজার ধারে। আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

করাতের ব্লেডের মত বাতাস যেন পোচ দিল গায়ে। মাফলারটা দিয়ে মাথা ঢেকেঢুকে নিলাম আমি। বার্টি দ্রুত মোজা পরে নিল।

'আমি তোমাদেরকে ভয় দেখাতে চাই না,' বলল হেনরি, মুখে অদ্ভুত হাসি। 'তবে যেতে যেতে বলব ছেলেটার গল্প...কারণ ঘটনাটা তোমাদের জানা দরকার।'

কোটের পকেট থেকে .৪৫ ক্যালিবারের একটা পিস্তল বের করল হেনরি। ১৯৫৮ সাল থেকে, দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা গুলি ভরা পিস্তলটা প্রস্তুত থাকে কাউন্টারের নীচে। একবার এক লোক মাস্তানি করতে এসেছিল হেনরীর সঙ্গে। লোকটাকে পিস্তল তুলে দেখানো মাত্র কেটে পড়েছিল সুড়সুড় করে। আরেকবার এক কলেজে পড়া ছোকরা চাঁদা চাইতে এসেছিল। তারপর এমনভাবে সে ছুটে পালায়, যেন ভূতে তাড়া করেছে।

প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে বেরিয়ে পড়েছি তিনজন। কার্ট ঠেলতে ঠেলতে ছেলেটার গল্প বলল হেনরি। ছেলেটা বলেছে

ঘটনার সূত্রপাত নিশ্চয় কোন বিয়ারের ক্যান থেকে। কিছু কিছু বিয়ার খুব বাজে স্বাদের হয়। একবার এক লোক আমাকে বলেছিল বিয়ারের কৌটায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকলেও তা দিয়ে ব্যাকটেরিয়া ঢুকে অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটাতে পারে। এসব ব্যাকটেরিয়া বিয়ার খেয়ে বেঁচে থাকে।

যা হোক, ছেলেটা বলল অক্টোবরের এক রাতে রিচি গোল্ডেন লাইট-এর এক কেস বিয়ার কিনে বাসায় ফেরে। সে বিয়ার খাচ্ছিল আর টিমি ব্যস্ত ছিল স্কুলের হোমওয়ার্ক নিয়ে।

টিমি ঘুমাতে যাবে, এমন সময় শুনতে পেল তার বাপ বলছে, 'জেসাস ক্রাইস্ট, জিনিসটা ভাল না।'

টিমি জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, বাবা?'

'ওই বিয়ার।' বলল রিচি। 'ঈশ্বর, এরকম বাজে স্বাদের বিয়ার জীবনেও খাইনি আমি।'

রিচির মত বিয়ারখেকো মানুষ দ্বিতীয়টি দেখিনি। একবার বিকেলে ওয়ালির স্পাতে ওকে দেখেছি বাজি ধরে বিয়ার খেতে। সে এক লোকের সঙ্গে বাজি ধরেছিল এক মিনিটে বাইশ গ্লাস বিয়ার সাবাড় করবে। স্থানীয় কেউ ওর সঙ্গে বাজি ধরার সাহস পায় না। কিন্তু এ লোকটা এসেছিল মন্টপেলিয়ের থেকে। সে কুড়ি ডলার বাজি ধরে। রিচি তিপ্পান্ন সেকেন্ডে কুড়িটি বিয়ার সাবড়ে দেয়। তারপরও বার ছেড়ে যাওয়ার সময় ওকে বিন্দুমাত্র টলতে দেখিনি।

'আমার বমি আসছে,' বলল রিচি। 'সাবধান!'

টিমি বলল সে বিয়ারের ক্যানের গন্ধ শুঁকেছে। মনে হয়েছে ভিতরে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। তারপর আর ওটার কোনও সাড়াশব্দ নেই। ক্যানের মাথায় ধূসর রঙের একটা বুদ্বুদ দেখেছে টিমি।

দিন দুই পরে ছেলেটা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখে রিচি টিভি দেখছে। অবাক হলো সে। কারণ তার বাপ ন'টার আগে কখনও বাড়ি ফেরে না।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল টিমি।

'ব্যাপার কিছু না। টিভি দেখছি,' জবাব দিল রিচি। 'আজ আর বেরুতে ইচ্ছে করল না।'

সিঙ্কের বাতি জ্বালিয়েছে টিমি, খেঁকিয়ে উঠল রিচি। 'বাতি নেভা!'

টিমি বাতি নেভাল, জানতে চাইল না বাতি ছাড়া অন্ধকারে সে হোমওয়ার্ক করবে কীভাবে। রিচির মেজাজ খারাপ হলে তার সঙ্গে কথা বলা যায় না।

'দোকান থেকে আমার জন্য একটা বিয়ার কিনে নিয়ে আয়,' হুকুম করল রিচি। 'টাকা টেবিলের উপর রাখা আছে।'

ছেলেটা বিয়ার নিয়ে ফিরে এসে দেখে বাপ তখনও বসে রয়েছে অন্ধকারে। টিভি অফ করা। গা ছমছম করে ওঠে ছেলেটার। অবশ্য অন্ধকার ফ্ল্যাটে বড়সড় একটা পিণ্ডের মত বাপকে ঘরের কোণে বসে থাকতে দেখলে কে না ভয় পাবে?

টিমি টেবিলের উপর বিয়ারের ক্যান রাখল। বাপের সামনে আসা মাত্র ভক্ করে পচা একটা গন্ধ নাকে ধাক্কা মারল তার। পচা চিজের বিটকেলে গন্ধ। কিন্তু বাপকে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল না টিমি। দরজা বন্ধ করে হোমওয়ার্ক নিয়ে বসল। কিছুক্ষণ পর শুনল চালু হয়েছে টিভি, সেইসাথে বিয়ারের ক্যান খুলছে রিচি।

হপ্তা দুই এরকমই চলল। ছেলেটা সকালে উঠে স্কুলে যায়। স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখে তার বাপ টিভির সামনে বসে আছে, টেবিলের উপর বিয়ার কেনার টাকা।

একদিন বিকেল চারটা নাগাদ বাসায় ফিরেছে টিমি– ততক্ষণে বাইরেটা কালো হয়ে এসেছে– রিচি হুকুম করল, 'আলো জ্বেলে দে।' সিঙ্কের বাতি জ্বালল টিমি। দেখল বাপ কম্বল মুড়ি দিয়ে বসা।

'দেখ,' বলে কম্বলের নীচে থেকে একটা হাত বের করে আনল রিচি। তবে ওটা হাত নয়। ধূসর রঙের একটা মাংসপিণ্ড। আঁতকে উঠল টিমি। জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, তোমার কী হয়েছে?'

রিচি জবাব দিল, 'জানি না। তবে ব্যথা লাগছে না। বরং...ভালই লাগছে।'

টিমি বলল, 'আমি ডাক্তার ওয়েস্টফেলকে ডেকে আনি।' তখন কম্বলটা ভয়ানক কাঁপতে শুরু করল, যেন ওটার নীচে কিছু প্রবল বেগে ঝাঁকি খাচ্ছে। রিচি বলল, 'খবরদার, ডাক্তারের কাছে যাবি না। সে চেষ্টা করলে তোর কপালে খারাবী আছে। তোর দশা হবে এরকম।' বলে মুখের উপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে ফেলল রিচি।

আমরা এতক্ষণে হার্লো ও কার্ভোস্ট্রিটের মোড়ে চলে এসেছি। শুধু ঠাণ্ডা নয়, ভয়েও গা-টা কেমন হিম হয়ে আছে আমার। এরকম গল্প হজম করা মুশকিল। তবে কিনা পৃথিবীতে অনেক আজব ঘটনাই ঘটে। জর্জ কেলসো নামে এক লোককে চিনতাম আমি। ব্যাঙ্গর পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে কাজ করত। পনেরো বছর সে কাটিয়েছে মাটির নীচে পানির পাইপ আর বৈদ্যুতিক তার মেরামতির কাজে। অবসর নেয়ার তখন মাত্র দু'বছর বাকি। একদিন সে চাকরিটা ছেড়ে দিল। ফ্রাঙ্কি হ্যান্ডম্যান ওকে চিনত। সে বলেছে জর্জ একদিন এসেক্সের একটি ড্রেনের পাইপ সারাতে হাসি মুখে,

স্বভাবসুলভ ঠাট্টা মশকরা করতে করতে মাটির নীচে নেমেছিল। পনেরো মিনিট পর যখন সে উপরে উঠে এল, তার সমস্ত চুল বরফের মত সাদা, চাউনি দেখে মনে হচ্ছিল নরক দর্শন করে এসেছে। সে সোজা ওয়ালি'র স্পাতে ঢুকে আকণ্ঠ মদপান শুরু করে। মদ খেয়ে খেয়ে দু'বছরের মাথায় মারা যায় জর্জ। ফ্রাঙ্কি ওর সঙ্গে কথা বলে জানার চেষ্টা করেছিল সিউয়ার পাইপে কী দেখে ভয় পেয়েছে জর্জ। জর্জ ফ্রাঙ্কিকে জিজ্ঞেস করেছিল সে কোনদিন কুকুর সাইজের মাকড়সা দেখেছে কিনা। ঘটনা কতটা সত্য আর কতটা অতিরঞ্জিত আমি জানি না, তবে পৃথিবীতে নিশ্চয় এমন ঘটনা ঘটে যা সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষকেও পাগল বানিয়ে ছাড়ে।

আমরা রাস্তার মোড়ে মিনিট খানেকের জন্য দাঁড়ালাম। যদিও তীব্র ঠাণ্ডা বাতাসের চাবুক আছড়ে পড়ছে গায়ের উপর।

'টিমি কী দেখল?' জিজ্ঞেস করল বার্টি।

'টিমি বলেছে ও ওর বাপকেই দেখেছে,' জবাব দিল হেনরি। 'তবে সারা গায়ে ধূসর জেলি মাখা। পরনের জামাকাপড় যেন গলে গিয়ে লেগে ছিল শরীরের সঙ্গে।'

'ঈশ্বর!' বলল বার্টি।

'রিচি আবার কম্বল দিয়ে মুড়ে নেয় নিজেকে এবং বাতি নিভিয়ে দেয়ার জন্য চেঁচাতে থাকে বাচ্চাটার উদ্দেশে।'

'ফাঙ্গাস বা ছত্রাকের মত দেখাচ্ছিল বোধহয় ওকে,' মন্তব্য করলাম আমি।

'হ্যাঁ,' সায় দিল হেনরি। 'অনেকটা সেরকমই।'

'পিস্তলটা রেডি রেখো,' বলল বার্টি।

'রেডি আছে,' বলল হেনরি। আমরা আবার হাঁটা দিলাম।

রিচি গ্রেনাডাইনের অ্যাপার্টমেন্ট হাউজটি পাহাড়ের প্রায় চূড়োতে, ভিক্টোরিয়ান আদলে গড়া। এগুলোকে এখন অ্যাপার্টমেন্ট হাউজে রূপান্তর ঘটানো হচ্ছে। বার্টি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রিচি তিনতলায় থাকে। আমি সুযোগ বুঝে হেনরির কাছে জানতে চাইলাম এরপরে বাচ্চাটার কী হলো।

নভেম্বরের তৃতীয় হপ্তায়, এক বিকেলে বাচ্চাটা বাসায় এসে দেখে তার বাপ প্রতিটি জানালা চাদর দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে। ঘরে বদ গন্ধটার তীব্রতা বেড়েছে আরও, কেমন ফল পচা গন্ধ।

হপ্তাখানেক ধরে রিচি তার ছেলেকে দিয়ে চুল্লিতে বিয়ার গরম করাল। ভাবা যায়? বেচারা দিনের পর দিন ওই বাড়িতে বসে চুল্লিতে বিয়ার গরম করছে আর শুনছে চুক চুক করে তা পান করছে তার বাপ।

এরকম চলল আজতক পর্যন্ত। আজ বাচ্চাটা ঝড়ো হাওয়ার কারণে ছুটি পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসেছিল বাসায়।

'ছেলেটি বলেছে সে সোজা ঘরে ঢুকে পড়ে,' আমাদেরকে বলল হেনরি। 'উপরতলায় হলঘরে একটি বাতিও জ্বলছিল না– টিমির ধারণা ওর বাপ সবগুলো বাল্ব ভেঙে রেখেছে। তাই প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে দরজার সামনে আসতে হলো ওকে।

'এমন সময় শুনতে পেল কিছু একটা নড়াচড়া করছে ওখানে, হঠাৎ টিমির মনে পড়ল তার বাপ সারাদিন কী করে সে সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। বাপকে সে গত একমাসে বলতে গেলে চেয়ার ছেড়ে নড়তেই দেখেনি। তার কি বাথরুমে যাওয়ারও প্রয়োজন হয় না!

দরজার মাঝখানে একটা ফুটো ছিল। ফুটোর মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে কৌশলে ছিটকিনি খুলে ফেলল টিমি। তারপর একটা

চোখ রাখল ফুটোতে।'

আমরা রিচির বাড়ির সামনে চলে এসেছি। আমাদের সামনে উঁচু, নোংরা একটা মুখের মত ঝুলে আছে বাড়িটি। তিনতলার জানালা বন্ধ। অন্ধকার। যেন কেউ কালো রঙ মেখে দিয়েছে জানালায়, যাতে বাইরে থেকে ভিতরে কী হচ্ছে বোঝা না যায়।

'অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল টিমির। তারপর প্রকাণ্ড ধূসর একটা পিণ্ড দেখতে পেল সে, মানুষের আকৃতির মত নয় মোটেই, মেঝের উপর গড়িয়ে চলছে, পিছনে রেখে আসছে ধূসর, পিচ্ছিল একটা চিহ্ন। সাপের মত একটা হাত বাড়িয়ে দিল ওটা– দেয়াল থেকে টান মেরে খুলে নিল একটা তক্তা। দেয়ালের গর্ত থেকে টেনে আনল একটা বেড়াল।' এক মুহূর্ত বিরতি দিল হেনরি। তারপর বলল, 'একটা মরা বেড়াল। পচা। গায়ে কিলবিল করছিল সাদা সাদা পোকা...'

'থামো,' কাতরে উঠল বার্টি। 'ঈশ্বরের দোহাই লাগে।'

'তারপর বেড়ালটা খেয়ে ফেলে রিচি।'

ঢোক গেলার চেষ্টা করলাম, দলা দলা কী যেন ঠেকল গলায়। 'তখন টিমি এক ছুটে পালিয়ে আসে ওখান থেকে,' সমাপ্তি টানল হেনরী।

'ওখানে আর যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না,' বলল বার্টি। হেনরি কোনও মন্তব্য করল না। বার্টি আর আমার উপর চোখ বুলাল শুধু।

'যাব,' বললাম আমি। 'রিচির জন্য বিয়ার নিয়ে এসেছি না!' বার্টি আর কিছু বলল না। আমরা সিঁড়ি বেয়ে সামনের হলরুমের দরজায় চলে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে নাকে ধাক্কা দিল গন্ধটা।

কী যে বিশ্রী, ভয়ঙ্কর, বোটকা গন্ধ! বমি ঠেলে এল গলায়।

হলঘরের নীচে একটা মাত্র হলুদ বাতি জ্বলছে টিমটিম করে। সিঁড়িগুলো উঠে গেছে উপরে, মিশেছে অন্ধকারে।

হেনরি তার কার্ট থামাল। ও বিয়ারের কেস তুলছে, আমি নীচের সিঁড়ির বোতামটা চেপে ধরলাম। দোতলার ল্যান্ডিং বাল্ব জ্বলে উঠবে। কিন্তু জ্বলল না। টিমি ঠিকই বলেছে সবগুলো বাল্ব ভেঙে রেখেছে ওর বাপ।

বার্টি কাঁপা গলায় বলল, 'আমি বিয়ার নিয়ে যাই। তুমি পিস্তল রেডি রাখো।'

আপত্তি করল না হেনরি। পিস্তল বাগিয়ে আগে আগে চলল। আমি ওর পিছনে, আমার পিছনে বিয়ার হাতে বার্টি। দোতলার ল্যান্ডিং-এ উঠে এলাম, গন্ধের তীব্রতা বাড়ল আরও। পচা আপেলের গন্ধ।

'প্রতিবেশীরা এই লোকটাকে লাথি মেরে দূর করে দিচ্ছে না কেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'কীসের প্রতিবেশী?' পাল্টা প্রশ্ন করল হেনরি। 'এ গন্ধে ভূত পালাবে। কে যাবে ওকে লাথি মেরে দূর করে দিতে?'

তিনতলায় উঠছি আমরা। এ তলার সিঁড়িগুলো আগেরগুলোর চেয়ে সরু এবং খাড়া। গন্ধে নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসার জোগাড়। উপরতলায় ছোট একটি হল, একটা দরজা দেখতে পেলাম, দরজার মাঝখানে ছোট একটি ফুটো। বার্টি প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'দেখো, কীসের মধ্যে এসেছি।'

হলঘরের মেঝেতে থকথকে পিচ্ছিল একটা জিনিস, ছড়িয়ে আছে সমস্ত জায়গায়। ছোট ছোট গর্ত এখানে-সেখানে। মনে হলো মেঝেতে এক সময় কার্পেট পাতা ছিল,

কিন্তু ধূসর জিনিসটা ওটা খেয়ে ফেলেছে।

হেনরি দরজার সামনে গেল, আমরা ওর পিছু নিলাম। বার্টির কথা জানি না, তবে ভিতরে ভিতরে ভয়ানক কাঁপুনি উঠে গেছে আমার। হেনরি পিস্তলের কুঁদো দিয়ে বাড়ি মারল দরজায়। 'রিচি?' ডাকল সে, কণ্ঠ শুনে মনে হলো না একটুও ভয় পেয়েছে। যদিও মুখ কাগজের মত সাদা। 'আমি নাইট আউল-এর হেনরি পার্মালি। তোমার বিয়ার নিয়ে এসেছি।'

পুরো এক মিনিট কোনও সাড়া নেই, তারপর বলে উঠল একটা কণ্ঠ, 'টিমি কোথায়? আমার ছেলে কই?' ভয়ের চোটে প্রায় দৌড় দিতে যাচ্ছিলাম। ওটা মোটেই মানুষের কণ্ঠ নয়। ঘরঘরে, অপার্থিব, ভৌতিক একটা আওয়াজ।

'ও আমার দোকানে আছে,' বলল হেনরি। 'খানা খাচ্ছে। ও না খেতে পাওয়া বেড়ালের মতই হাড্ডিসার হয়ে গেছে।'

এক মুহূর্ত কিছুই শোনা গেল না, তারপর ভয়ঙ্কর একটা ঘরঘরে শব্দ ভেসে এল। আত্মা কাঁপিয়ে দেয়া গলাটা দরজার ওপাশ থেকে বলল, 'দরজা খুলে বিয়ারটা ভিতরে ঠেলে দাও। আমি খুলতে পারব না।'

'এক মিনিট,' বলল হেনরি। 'এ মুহূর্তে তোমার কী অবস্থা, রিচি?'

'তা দিয়ে তোমার দরকার নেই,' বলল কণ্ঠটা, 'বিয়ার দিয়ে চলে যাও।'

'মরা বেড়ালে আর চলছে না, তাই না?' বলল হেনরী। হাতে বাগিয়ে ধরল পিস্তল।

বিদ্যুৎ চমকের মত একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল হেনরির কথাটা শুনে। গত তিন হপ্তায় দুটি তরুণী আর এক বুড়ো সৈনিক নিখোঁজ হয়েছে– সকলেই সন্ধ্যার পরে।

'হয় বিয়ার দাও, নয়তো আমি নিজেই বেরিয়ে আসব,' বলল ভয়ঙ্কর কণ্ঠ।

হেনরি আমাদেরকে ইশারা করল পিছু হঠতে। আমরা তাই করলাম। 'ইচ্ছে হলে আসতে পারো, রিচি,' পিস্তল কক্ করল হেনরি।

ঠিক তখন প্রচণ্ড ধাক্কায় খুলে গেল দরজা। বেরিয়ে এল রিচি। তারপর এক সেকেন্ড, মাত্র এক সেকেন্ড দৃশ্যটা দেখলাম, তারপর তিন তলা থেকে লাফাতে লাফাতে নীচে চলে এলাম আমি আর বার্টি একেকবারে চার/পাঁচটা সিঁড়ি টপকে। বরফের উপর ডিগবাজি খেয়ে পড়লাম। হাচড়েপাচড়ে উঠে দিলাম ছুট।

ছুটতে ছুটতে শুনলাম হেনরির পিস্তলের আওয়াজ। পরপর তিনবার।

আমি এক বা দুই সেকেন্ডের জন্য যে দৃষ্টি দেখেছি তা জীবনেও ভুলব না। জেলির প্রকাণ্ড একটা ঢেউ, অনেকটা মানুষের আকারের; থকথকে, পিচ্ছিল একটা জিনিস পিছনে ফেলে এগিয়ে আসছিল।

তবে ওর চেয়েও ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছিল। ওটার চোখ হলুদ, বুনো, আর সমতল, তাতে মানুষের আত্মার চিহ্ন নেই। তবে চোখ দুটো নয়। চারটে। জিনিসটা মাঝখানে, দু'জোড়া চোখের মধ্যে সাদা, আঁশের মত গোলাপি মাংসখণ্ড কিলবিল করছিল।

ওটা ভাগ হয়ে যাচ্ছিল। একটা থেকে দুটো।

আমি আর বার্টি দোকানে ফিরে এলাম একটিও বাক্য বিনিময় না করে। জানি না ও কী ভাবছে, তবে আমার দুই ঘরের নামতা মনে পড়ে যাচ্ছিল। দু'দুগুণে চার, চার দু'গুণে

আট, আট দু'গুণে ষোলো, ষোলো দু'গুণে–

আমাদেরকে দেখে লাফিয়ে উঠল কার্ল আর বিল পেলহ্যাম। ঝড়ের বেগে প্রশ্ন করতে লাগল। তবে দু'জনের কেউই কিছু বললাম না। অপেক্ষা করছি হেনরির জন্য। ও ফিরে আসে নাকি ওটা, দেখব। আশা করি হেনরিই ফিরে আসবে।

মূল: স্টিফেন কিং

রূপান্তর: অনীশ দাস অপু

***

হরর কাহিনী

ধূসর আতঙ্ক

অনীশ দাস অপু

এক ডজন গল্প নিয়ে প্রকাশিত হলো
এবারের হরর সংকলন। এ বই শুধু তাঁদের জন্য
যাঁরা ভয় পেতে ভালবাসেন। গ্যারান্টি-বিচিত্র
এবং ভিন্ন স্বাদের গল্পগুলো পড়ার সময় ভয়-আতঙ্ক
আর বিস্ময় আপনাকে ঘিরে থাকবে।
আপনি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন,
কোনও কোনও নবীন লেখক তাঁর গল্পে
দক্ষতার সঙ্গে ভয়াল আবহ সৃষ্টিতে অনেক প্রতিষ্ঠিত
সাহিত্যিককেও ছাড়িয়ে গেছেন!



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০